কাগজের নৌকা

রোমেনা আফাজ

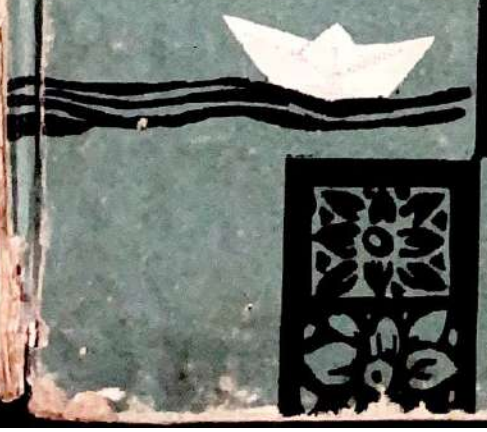

কাগজের নৌকা

(উপন্যাস)

রোমেনা আফাজ

Library;
COLLEGE OF HOME ECONOMICS,
Dacca.

ইউসুফ্‌জী পাবলিকেশান্স্‌
২৮, কোতোয়ালী রোড
ঢাকা—১

প্রকাশনায় ঃ
এন, ইউসুফজী
ইউসুফ্‌জী পাবলিকেশান্স
২৮, কোতোয়ালী রোড
ঢাকা—১

প্রচ্ছদ পটে ঃ
সুভাষ দত্ত

মুদ্রনে ঃ
এম, এইচ, চৌধুরী
সুলেখা প্রিন্টিং প্রেস
১৬/১ জিন্দাবাহার ১ম লেন
ঢাকা—১

A-3886/70

ব্লকে ঃ লিঙ্ক ম্যান এণ্ড কোং
বাংলা বাজার, ঢাকা—১

প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই, ১৯৬৬

সর্বস্বত্ব ঃ প্রকাশকের

দাম ঃ তিন টাকা।

উৎসর্গ

স্নেহের—

সুভাষ দত্তকে

তোমার—

কাকী.মা

COLLEGE OF HOME ECONOMICS,
Library,

ছায়াঘন বনানী ঘেরা স্নিগ্ধ শীতল গ্রামখানি।

নাম চন্দনপুর।

যদিও চন্দনের সুবাসে ভরানয় এই গ্রামখানি ; তবু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অভাব নেই সেখানে। গ্রামের অনতিদূর দিয়ে বয়ে চলেছে একটি ছোট নদী। নদীটা চন্দনপুর গ্রামের বুকচিরে সরীসৃপের মত আঁকা বাঁকা হয়ে চলে গেছে দূরে বহুদূরে শহরের দিকে।

চন্দনপুর গ্রামটা একেবারে ছোট নয়। এখানে থানা এবং অন্যান্য অফিসও রয়েছে। আর আছে একটি স্কুল।

স্কুলে চন্দনপুরের ধনী ও গরীব সকলেরই ছেলে মেয়ে পড়া-শোনা করে।

গ্রামের পূর্ব অঞ্চলে সার্কেল অফিসার তমিজ উদ্দিন সাহেবের বাড়ী। বিরাট বাড়ী, বাড়ীর সম্মুখে ফুলের বাগান। এক পার্শে আম কাঠালের সারি। পাশ দিয়ে একটা সরু রাস্তা চলে গেছে স্কুলের দিকে।

তমিজ উদ্দিন সাহেবের একমাত্র সন্তান সাজ্জাদ এই স্কুলে পড়ে। সাজ্জাদের মা নেই, সাজ্জাদের জন্মের কিছুকাল পরেই তিনি ইন্তে-কাল করেছিলেন। একমাত্র সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়েই তমিজ-উদ্দিন সাহেব আর বিয়ে করেন নি। পুরনো চাকর মান্নানের উপরই তিনি পুত্র সাজ্জাদের ভার অর্পণ করে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

মান্নান শিশু সাজ্জাদকে বুকে পিঠে করে মানুষ করেছে। খিদের সময় দুধ খাইয়েছে। কান্নার সময় কাঁধে করে ঘুরে নিয়ে বেরিয়েছে। আর ঘুমোনর সময় পাশে শুয়ে চাপড়ে চাপড়ে ঘুমপাড়ানিয়া গান গেয়ে ঘুমিয়েছে। বড়ভাল বাসে মান্নান সাজ্জাদকে।

তমিজ উদ্দিন সাহেবের ফরমাস খেটে, ঘরদোর পরিষ্কার করে বাবুর্চিকে রান্নার জোগার দিয়ে গোসল করে আসতো মান্নান।

ততক্ষণে বাবুর্চ্চির রান্না শেষ হতো। মান্নান তাড়াহুড়ো করে সাজ্জাদের খাবার টিফিন-ক্যারিয়ারে নিয়ে ছুটতো স্কুলের পথে।

মা হারা এই শিশুটির জন্য মান্নানের দরদের সীমা ছিল না।

সাজ্জাদের স্কুলেই পড়ে সালেহা।

ফুট ফুটে সুন্দর মেয়েটি। একটি গোলাপ কুঁড়ির মতই সে দেখতে পাতলা ছিপ ছিপে গঠন। মাথায় কোঁকড়ানো লম্বা চুল। একটা বিনুনী করে পিঠে ঝুলিয়ে রাখে। গভীর নীল দুটি চোখে মায়াময় চাহনী। মেয়েটিকে দেখলেই কেমন যেন মায়া হয়।

গরীব বিধবা নানীর নাতনী সালেহা।

সালেহা শিশু কালেই পিতা মাতাকে হারিয়েছে। মা মারা যাবার পর বাপও চলে গেলেন পরপারে। অকুল সাগরে ভাসলো শিশু সালেহা। এতোটুকু মেয়ে যে, কিছুই বোঝেনা, কিছুই জানেনা। শুধু জানে সে কাঁদতে।

নীরবে কাঁদে সালেহা।

পিতা-মাতার অভাব তেমন করে না বুঝলেও পিতা মাতার অদর্শনে অস্থির হয়ে পড়ে সে।

নাতনীর করুণ অশ্রু ছল ছল মুখখানা নানীর হৃদয়কে ব্যথায় জর্জ্জরিত করে তোলে। নানীও রোদন করেন নাতনীর সঙ্গে। শিশু সালেহার অদৃষ্টের এই নির্ম্মম পরিণতি বৃদ্ধার মনকে দগ্ধিভূত করে তোলে।

সেই থেকে বৃদ্ধা সালেহাকে নিয়ে চন্দনপুর গ্রামেই থেকে যায়। তারপর অতি দুঃখ কষ্টের মধ্যে নাতনীকে তিনি মানুষ করতে লাগলেন। তাঁর বড় আশা নাতনীকে তিনি লেখা পড়া শিখাবেন। তাই একদিন ভর্তি করে দিলেন সালেহাকে গ্রামের স্কুলে।

একই পথে সালেহা আর সাজ্জাদ স্কুলে আসে।

রোজ আসে আর রোজ যায়। একদিন সালেহাকে জিজ্ঞাসা করে সাজ্জাদ—তোর নাম কিরে ?

সালেহা জিভ্ বেরকরে ভেংচায়, তারপর জবাব দেয় সে—সালেহা। শুনলেতো আমার নাম ? এবার বলো তোমার নাম কি ?

আমার নাম সাজ্জাদ।

বেশ নাম তো তোমার।

এমনি করে গড়ে উঠে দু'জনার মধ্যে একটা সরল স্বাভাবিক ভালবাসা।

স্কুলের টিফিনের সময় একটা গাছের নীচে গিয়ে ওরা দু'জনা বসে পাশা পাশি। খেলা করে বালির ঘর বানিয়ে, কখনও বা কাগজের নৌকা তৈরী করে সালেহাকে উপহার দেয় সাজ্জাদ।

সালেহা অবাক হয়ে দেখতে থাকে কাগজের নৌকাটা। কেমন-করে এটা তৈরী করে সাজ্জাদ। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। সাজ্জাদ বলে—এই সামান্য কাগজের নৌকা দেখেই অবাক হচ্ছিস সালেহা। দেখবি আমি কালকে আর একটি খেলা দেখাবো তোকে।

সত্যি !

হাঁ, দেখবি লেবুর রসে রক্ত তৈরী করবো।

সালেহা কথা বলতে পারেনা, শুধু স্থির দৃষ্টিমেলে তাকিয়ে থাকে। দু'চোখে তার রাজ্যের বিস্ময়।

এমনি করে দিনের পর দিন কেটে চলে।

টিফিনের ঘণ্টা বেজে উঠে।

উৎফুল্ল হয়ে উঠে ছেলেমেয়েদের মুখ মণ্ডল। তাড়াতাড়ি বইপত্তর গুছিয়ে রেখে বেরিয়ে আসে সবাই স্কুল থেকে।

সকলের সঙ্গে স্কুল থেকে বেরিয়ে আসে সাজ্জাদ। অন্যান্য ছেলে-দের কাছ থেকে দূরে সরে দাঁড়ায় সে। ব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে খোঁজে সে সালেহাকে।

অদূরে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে মান্নান। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে তাকিয়ে আছে সে সাজ্জাদের দিকে। মুখে মৃদু মৃদু হাসি, মনে মনে কিছু

ভাবছে যেন সে! কাঁধে গামছা, মাঝে মাঝে গামছায় মুখের ঘাম মুছে নিচ্ছিলো মান্নান। দক্ষিণ হস্তে টিফিন্-ক্যারিয়ার।

সাজ্জাদের জন্য খাবার এনেছে সে।

সাজ্জাদ এসে বসলো গাছটার নীচে, একটা আনমনা ভাব নিয়ে তাকাচ্ছে এদিক সেদিক।

মান্নান টিফিন-ক্যারিয়ারটা রাখলো সাজ্জাদের সামনে—এতে তোমার খাবার আছে। তারপর ঢাক্না খুলে ফেলে বলে খাও।

সাজ্জাদ অন্যমনস্ক ভাবে খাবার মুখে তুলে দিতে যায়, হঠাৎ থেমে পড়ে সে। তাকালো সম্মুখের দিকে। মুহূর্তে সাজ্জাদের মুখ মণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

অদূরে দাঁড়িয়ে সালেহা মিটি মিটি হাসছে। ফুর ফুরে হাওয়ায় চুলগুলি উড়ছে। দক্ষিণ হস্তে কয়েকটি ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

সাজ্জাদ ডাকে—সালেহা, শোন্।

এগিয়ে আসে সালেহা।

সাজ্জাদ সালেহার হাত ধরে পাশে বসিয়ে দেয়। তারপর খাবার নিয়ে গুঁজে দেয় ওর মুখে।

খেতে খেতে হাসে দু'জনা।

মান্নানও হাসে।

ছোট্ট দুটি বালক বালিকার এই মধুর মিলন তার অন্তরে একটা আনন্দের হিল্লোল বয়ে আনে।

অদূরে ছেলে মেয়েরা খেলা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। কেউ বা ছুটো ছুটি করছে। কেউবা কাগজের পাখী বানিয়ে উপরের দিকে ছুড়ে মারছে। কেউবা লুকোচুরি খেলছে।

দু'একটি ছেলে লক্ষ্য করছে সাজ্জাদ আর সালেহাকে। ওদের এক সঙ্গে খেতে দেখে মুখ টিপে হাসছে ওরা।

খাওয়া শেষ করে মুখো মুখি বসে সাজ্জাদ আর সালেহা। সাজ্জাদ পকেট থেকে একটা লেবু আর একটা ছোট্ট ছুরি বের করে বলে—সালেহা দেখবি; লেবুটা কেটে কেমন রক্ত বের করবো।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে সালেহা—লেবু কেটে রক্ত বের করবে! কেমন করে রক্ত বের হবে সাজ্জাদ?

সাজ্জাদ চাকু দিয়ে লেবুটা কেটে ফেলে। লাল রক্তের মত রস গড়িয়ে পড়ে সাজ্জাদের হাত বেয়ে।

সালেহা বলে উঠে—ইস্ রক্ত!

মান্নান কিন্তু সব জানে, সাজ্জাদ বাড়ী থেকে কায়দাটা শিখে এসেছে, মৃদু হাসে মান্নান।

সাজ্জাদ আর সালেহা যখন লেবুর রসে রক্ত তৈরী নিয়ে ব্যস্ত ছিলো তখন একটা মোটা সোটা ছেলে এগিয়ে আসে তাদের পাশে। মুখ ভেংচে বলে—এ বাহাদুরী সবাই পারে। খুবতো মজা দেখাচ্ছিস্।

সাজ্জাদ রেগে উঠে—তোকে আর মাতব্বরী দেখাতে হবে না। ভাগ্ বলছি এখান থেকে।

ছেলেটা আবার মুখ ভেংচায়।

সাজ্জাদ তেড়ে উঠে—দাঁড়া দেখাচ্ছি মজাটা।

এবার ছেলেটা ভয় পেয়ে যায়। সাজ্জাদের চেয়ে ছেলেটা যদিও মোটা সোটা কিন্তু শক্তিতে সে মোটেই সাজ্জাদের মত নয়। কাজেই তাড়া খেয়ে দৌড় দেয় ছেলেটা।

সালেহা খিল খিল করে হেসে উঠে।

ছেলেটা তখন ছুটতে ছুটতে অনেক দূরে চলে গেছে।

সালেহা সাজ্জাদকে লক্ষ্য করে বলে—বোস, একটা ধাঁধাঁ ধরছি, বলতে পারবে?

সাজ্জাদ পলাতক ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলে—পারবো। বসে পড়ে সাজ্জাদ তারপর বলেউঠে—বল্ তোর ধাঁধাঁ কেমন?

সালেহা ভাল হয়ে বসে বলে—শোন তবে বলছি।

"তিন অক্ষরে নাম তার সকলের ঘরে থাকে।
শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে মানুষকে কামড়ায়
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে সর্ব্বলোকে খায়।
বলো তো কি?

এতোক্ষণ সাজ্জাদ কাগজের নৌকা আর লেবুর রসে রক্ত বানিয়ে সালেহাকে তাক্ লাগিয়ে দিচ্ছিলো এবার সে আমতা আমতা করে বলে—ওঁ, সর্ব্বলোকে খায় ? ভাবতে থাকে সাজ্জাদ।

সালেহা এবার সাজ্জাদকে মস্ত জব্দ করে দিয়েছে। ওর অবস্থা দেখে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে সালেহা।

মান্নান ওদিকে দাঁড়িয়ে ওদের তামাসা দেখ ছিলো, এবার বলে উঠে সে—আমি বলি ?

সালেহা বাধা দিয়ে বলে উঠে—খবরদার বলবে না।

সাজ্জাদ হার মানে, গম্ভীর কণ্ঠে বলে—আমি পারলুম না।

সালেহা খিল খিল করে হেসে উঠে—"বিছানা।" পারলে না তো বলতে।

মাথা চুলকায় সাজ্জাদ। সালেহার ধাঁধাঁটার উত্তর দিতে না পেরে মনে মনে বিব্রত বোধ করে। কিন্তু দমবার ছেলে নয় সাজ্জাদ। বলে উঠে—আচ্ছা, আরও একটা খেলা আছে। দেখবি সালেহা ?

কিন্তু ঠিক্ সেই মুহূর্তে ঘণ্টা বেজে উঠে।

সালেহা অন্য একটি ছেলের হাতে একটা কাগজের নৌকা দেখে বলে—ঐ রকম একটা কাগজের নৌকা দেবে ?

সাজ্জাদ তখন উঠে দাঁড়িয়েছে—আচ্ছা কাল দেবো। চলো।

মান্নান তখন টিফিন-ক্যারিয়ার হাতে উঠে দাঁড়িয়েছে।

সাজ্জাদ আর সালেহা চলে যায় স্কুলের দিকে।

মান্নান ওদের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে দেখে নেয়, তারপর বাড়ীর পথ ধরে।

বাঁশ ঝাড় আর আমগাছের ফাঁকে দেখা যায় ছোট্ট একটি কুঠির। সন্ খড়ে ছাওয়া পুরোনো চালা। কোথাও বা খড় পঁচে গিয়ে বাঁশের বাতি বেরিয়ে পড়েছে। বাঁশের খুঁটোগুলিও অনেক দিনের পুরোনো। বেড়াগুলিও রুই পোকা আর ঘুনে কেমন যেন ঝড় ঝড়ে করে ফেলেছে

কুঠিরের সম্মুখেই ছোট্ট উঠান। উঠানের একপাশে লাউ মাচা রয়েছে। কয়েকটা ডাটা গাছ ও রয়েছে সেখানে।

সন্ধ্যা বনিয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

সালেহা দাওয়ায় বসে পড়াশোনা করছে। তার সম্মুখে একটা মাটির প্রদীপ জ্বলছে। মাঝে মাঝে দম্‌কা হাওয়ায় প্রদীপটা নিভু নিভু হয়ে আসছিলো।

সালেহা হাতের আড়ালে প্রদীপের আলো বাঁচিয়ে বইএর পাতায় দৃষ্টি বুলিয়ে যাচ্ছিলো।

মাদুরের এক কোণে বসেছিলেন সালেহার নানী সখীনা খাতুন। সালেহার পড়ার শব্দগুলি মনোযোগ সহকারে শুনছিলেন তিনি। সালেহার পড়াশোনা সখীনা খাতুনের বড় ভাল লাগে। নিজে তিনি লেখা পড়া জানেন না কিন্তু লেখা পড়া শেখার যে আনন্দতা অনুভব করেন সখীনা খাতুন মন-প্রাণে।

সালেহাকে নিয়ে সখীনা খাতুনের অনেক আশা। ওকে নিয়ে বৃদ্ধা মনে মনে রঙিন স্বপ্ন রচনা করেন।

পড়তে পড়তে হঠাৎ বলে উঠে সালেহা—নানী, ঐ ধাঁধাঁটার উত্তর দিতে পারেনি সাজ্জাদ। আর একটা শিখিয়ে দাও না?

ফোক্‌লা মুখে নানী হেসে উঠেন—তাই নাকি! তাহলে তো তাকে খুব জব্দ করে দিয়েছিস্।

হাঁ নানী আজ আর একটা শিখিয়ে দাও।

শোন বলছি।

বলো নানী। তুমি আমার লক্ষী নানী.....।

সালেহা বই বন্ধ করে নানীর পাশে এসে বসে।

নানী বলে—শুঁড় দিয়ে কাজ করি নই আমি হাতী।
পরের উপকার করি তবু খাই লাথী।

সালেহা বলে উঠে—কি নানী, বলোনা। বলোনা নানী?

নানী হেসে বলে—পারলি না তো। "ঢেঁকী।"

সত্যি নানী তুমি কত ভাল। এ তো সুন্দর সুন্দর ধাঁধাঁ জানো। দেখো নানী আমি বড় হয়ে তোমার মত অনেক ধাঁধাঁ শিখবো।

আচ্ছা শিখিস্। যা এবার পড়বি যা বোন।

সালেহা আবার মনোযোগ সহকারে পড়াশুরু করে।

সালেহা যখন নানীর কাছে ধাঁধাঁ শিখছে তখন সাজ্জাদ নিজের ঘরে বসে সাদা কাগজে একটা পাখী আঁকে। সুন্দর পাখী। অনেকক্ষণ ধরে আঁকলো পাখীটা। তারপর আলোর পাশে ধরে দেখতে লাগলো, নিজে নিজেই বলে উঠে—এইবার সালেহাকে একেবারে তাক্ লাগিয়ে দেবো।

সাজ্জাদের আশেপাশে বইগুলি বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে পড়ে আছে। সে একটির পর একটি ছবি সাদা কাগজে লেবুর রসে আঁকছে। রাত বেড়ে আসে।

পাশের ঘরে সাজ্জাদের আব্বা তমিজ উদ্দিন সাহেব অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বই পড়ছিলেন। বইখানা পাশের টেবিলে রেখে সোজা হয়ে বসেন তারপর ডাকেন—সাজ্জাদ!

সাজ্জাদ তাড়াতাড়ি লেবুর রসে আঁকা কাগজের টুকরাগুলি একখানা বইএর তলায় চাপা দিয়ে শব্দ করে পড়তে শুরু করে। এবার সাজ্জাদকে দেখলে খুব মনোযোগী ছাত্র বলে মনে হচ্ছে। ঝুকে ঝুকে পড়তে থাকে সাজ্জাদ।

পাশের ঘর থেকে আবার ডাকেন তমিজ উদ্দির সাহেব—সাজ্জাদ!

যাই আব্বা। বইগুলি গুছিয়ে রেখে উঠে পড়ে সাজ্জাদ।

মান্নান হেসে বলে—সাদা কাগজে ও সব কি করছিলে ছোট সাহেব?

কিছু না। খবরদার আব্বার কাছে যদি বলবি.....

না না আমি কেনো বলতে যাবো ছোট সাহেব।

এই নে বইগুলি ঘরে রেখে আয়।

মান্নানের হাতে বইগুলি গুঁজে দিয়ে পিতার ঘরের দিকে এগিয়ে যায় সাজ্জাদ।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বলে—আমায় ডাকছো আব্বা ?

হাঁ বাবা ! শোন।

সাজ্জাদ পিতার বিছানার পাশে গিয়ে বসে।

তমিজ উদ্দিন সাহের পুত্রের মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন—কেমন পড়া-শোনা হচ্ছে সাজ্জাদ ?

ভালই হচ্ছে আব্বা।

এবার পরীক্ষায় পাশ করলে কি নেবে বললে না তো ?

খুব ভাল একটা মোটর গাড়ী নেবো আব্বা। খুব বড় গাড়ী দেবে তো ?

নিশ্চই দেবো। কিন্তু এখন চালাতে পারবে ?

নিশ্চয়ই পারবো।

আচ্ছা দেবো তাহলে। চলো, এবার খাবে চলো। বিছানা ত্যাগ করে উঠে পড়েন তমিজ উদ্দিন সাহেব। পুত্রের হাত ধরে খাবার ঘরে এসে হাজির হন।

মান্নান টেবিলে খাবার সাজিয়ে রেখে এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো।

পিতা-পুত্র আসন গ্রহণ করতেই মান্নান খাবারের প্লেটগুলি এগিয়ে দেয় তাঁদের সম্মুখে।

খেতে খেতে অনেক গল্প করেন তমিজ উদ্দিন সাহেব সাজ্জাদের সঙ্গে। মা মরা ছেলেটিকে তিনি এতো স্নেহ করেন যেন সে কোনদিন মায়ের অভাব বুঝতে না পারে।

সাজ্জাদের প্রতি তমিজ উদ্দিন সাহেবের সর্তক দৃষ্টির অভাব নেই। কখন খেলো, কখন ঘুমোলো সব লক্ষ্য করতেন তিনি। যদিও মান্নানের অপরিসীম স্নেহ সাজ্জাদের গোটা মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তবু পিতৃ হৃদয় সর্ব্বদা আকুল থাকতো মাহারা সন্তানটির জন্য।

তমিজ উদ্দিন সাহেব জানতেন মান্নান থাকতে তাঁর সাজ্জাদের কোন ত্রুটি হবেনা। তাঁর নজরের চেয়েও আরও নিবিড়-গাঢ় দৃষ্টি রয়েছে

মান্নানের। তাহলেও তমিজ উদ্দিন সাহেব যতক্ষণ না পুত্রের সন্ধান নিয়েছেন ততক্ষণ যেন স্বস্তি পেতেন না।

যখন তিনি সাজ্জাদ সম্বন্ধে সমস্ত কিছু জানতে পারতেন, তখন তিনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে যেতেন।

পরদিন টিফিনের পূর্বের সেই গাছটির নীচে গিয়ে পাশাপাশি বসলো সাজ্জাদ আর সালেহা।

ইতি পূর্বে মান্নান টিফিন-ক্যারিয়ারে খাবার নিয়ে হাজির হয়েছে। আজও দু'জন মিলে খাবার খায়।

খাওয়া শেষ করে হাতের পিঠে মুখ মুছতে মুছতে বলে সাজ্জাদ। যে কথাটা এতোক্ষণ সে অতি কষ্টে মনের মধ্যে চেপে রেখে ছিলো। স্কুলে আসার পর থেকে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো সে। এবার বলে উঠে—সালেহা আজ একটা মজার খেলা দেখাবো তোকে।

কি খেলা সাজ্জাদ ভাই! কই দেখাও না?

পকেট থেকে কয়েকটা সাদা কাগজের টুকরা বের করে বলে সাজ্জাদ—এই দেখো সাদা কাগজ। এতে কিছু নেই তো?

না।

সাজ্জাদ মান্নানকে লক্ষ্য করে বলে—দাও তো মান্নান ভাই একটু পানি।

মান্নান একটা টিফিন-ক্যারিয়ার বাটিতে কিছুটা পানি ঢেলে এগিয়ে দেয় সাজ্জাদের দিকে—নাও ছোট সাহেব।

সাজ্জাদ পানি সহ বাটিটা নিয়ে তার মধ্যে কাগজের টুকরোটা ভেজালো। সঙ্গে সঙ্গে কাগজের বুকে একটা পাখী ফুটে উঠলো। এবার সাজ্জাদ কাগজ খানা তুলে ধরলো সালেহার চোখের সম্মুখে—এই দেখ!

সালেহা বিস্ময়ে দুই গালে হাত রেখে বলে উঠে-ইস্ কি অদ্ভুত! তাই না মান্নান ভাই?

হেসে বলে মান্নান—হাঁ সবই অদ্ভুত।

সালেহার এ সব শিখবার বড় সাধ হয়। সে মিনতি ভরা সুরে বলে—আমাকে শিখিয়ে দাও না সাজ্জাদ ভাই।

সাজ্জাদ মুখটা গম্ভীর করে বলে—দেবো। তারপর খাতার মধ্যে থেকে একটা কাগজের নৌকা বের করে বলে—এই নে তোর কাগজের নৌকা।

সালেহা কাগজের নৌকা হাতে নিয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে। খুশী ভরা গলায় বলে সে—খুব সুন্দর হয়েছে।

সাজ্জাদ বলে—এটার মধ্যে একটা যাদু আছে সালেহা। বাড়ীতে গিয়ে নৌকাখানা পানিতে ডুবিয়ে দেখবি।

সালেহা নৌকাটা ভাজ করে খাতার মধ্যে রেখে উঠে দাঁড়ায়।

সাজ্জাদ চোখের ইশারা করে বলে—চল্ খেলা করি।

সালেহা হেসে বলে—চলো যাই।

সাজ্জাদ মান্নানকে লক্ষ্য করে বলে—মান্নান ভাই চললুম। তারপর ছুটতে শুরু করে ওরা দু'জনা।

মান্নান চেঁচিয়ে বলে উঠে—বেশী দূরে যেন যেওনা।

না, বেশী দূরে যাবোনা মান্নান ভাই। এই তো এখানে। ছুটতে ছুটতে চীৎকার করে বলে সাজ্জাদ।

মুক্ত বিহঙ্গমের মত ডানা মেলে উড়ে যেতে চায়, ওরা দু'জনা। ছুটতে ছুটতে অনেক দূর এসে পড়ে সাজ্জাদ আর সালেহা। দু'জন তাকায় দু'জনার মুখের দিকে। তারপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

সম্মুখে পাগলা পীরের মাজার দেখতে পায় তারা।

সালেহা বলে উঠে—দেখছো, এটা পাগলা পীরের মাজার।

জানি। আয় সালেহা আমরা এখানে মোনাজাত করি।

অবাক হয়ে তাকায় সালেহা সাজ্জাদের মুখের দিকে, দু'চোখে তার প্রশ্নভরা দৃষ্টি।

সাজ্জাদ বলে—এখানে মনের বাসনা জানিয়ে দোয়া চাইতে হয়। পীরের দোয়ায় খোদা তার মনের বাসনা পূর্ণ করেন।

সত্যি ?

হাঁ।

এসো সাজ্জাদ ভাই আমরা তা হলে দোয়া চাই।

এসো।

পীরের মাজারের পাশে গিয়ে পাশাপাশী দাঁড়াল ওরা, সাজ্জাদ আর সালেহা হাত তুলে মোনজাত করে।

সাজ্জাদ দু'হাত উঁচু করে বিড়বিড় করে কিছু বলছিলো, দু'চোখ তার বন্ধ রয়েছে।

সালেহা চুপি চুপি সরে পড়ে সেখান থেকে।

সাজ্জাদ চোখ খুলে সালেহাকে আর দেখতে পায় না, এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজতে থাকে সে। তারপর ডাকে—সালেহা··· সালেহা···

অদূরে একটা গাছের আড়াল থেকে টুকু দেয় সালেহা।

সাজ্জাদের মুখে দুষ্টামির হাসি ফুটে উঠে। পা টিপে টিপে গাছটার দিকে এগয় সে।

কিন্তু সাজ্জাদ পৌঁছবার পূর্বেই সালেহা সেখান থেকে সরে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে।

সাজ্জাদ খুঁজতে থাকে, গাছের আড়ালে সালেহাকে না দেখে আপন মনেই বলে উঠে দুষ্ট মেয়েটা গেলো কোথায় ?

সালেহা পুনরায় ঝোপের আড়াল থেকে টুকু দেয়।

এবার সাজ্জাদ সালেহাকে দেখে ফেলে; ধরতে যায় ওকে। কিন্তু সালেহা এ গাছের আড়াল থেকে ও গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে।

সাজ্জাত কিন্তু নাছোড় বান্দা, সালেহাকে ধরবেই। সেও ওকে ধরবার জন্য ছুটা ছুটি করে।

সাজ্জাদ সালেহাকে ধরতে পারে না।

হাসে সালেহা।

এবার সালেহাকে সাজ্জাদ ধরে ফেলে। সাজ্জাদ ওকে বলে চল্ সালেহা এবার যাই।

চলো।

সালেহা সাজ্জাদের দেওয়া কাগজের নৌকা খানা হাতে নিয়ে সাজ্জাদের সঙ্গে এগিয়ে চলে।

পাগলা পীড়ের মাজার ছাড়িয়ে নদীর তীর বেয়ে চলতে থাকে ওরা দু'জন।

হঠাৎ সালেহার হাত থেকে কাগজের নৌকা খানা পড়ে যায় নদীর পানিতে।

সালেহা থমকে দাঁড়িয়ে বলে উঠে—এই—যা—আমার কাগজের নৌকাটা নদীতে পড়ে গেছে।

ততক্ষণে সাজ্জাদও দাঁড়িয়ে পড়েছে।

দূর থেকে স্কুলের ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসে।

সাজ্জাদ বলে উঠে—ঘণ্টা পড়ে গেছে, চল, তাড়াতাড়ি।

তুমি না বলে ছিলে সাজ্জাদ ভাই ওর মধ্যে যাদু আছে।

আবার বানিয়ে দেবো। চল্। সালেহার হাত ধরে দ্রুত এগিয়ে চলে সাজ্জাদ।

ওদিকে সালেহার হাত থেকে পড়ে যাওয়া কগেজের নৌকাখানা নদীর বুকে ধীরে ধীরে ভেসে চলে।

স্কুল কক্ষ।

সমস্ত ছেলে মেয়ে যার যার ক্লাশে ক্লাশে বসে পড়ে।

মাষ্টার সাহেব স্কুল কক্ষে প্রবেশ করে। সাজ্জাদ আর সালেহার শূন্য স্থান দেখতে পেয়ে গর্জে উঠেন—সাজ্জাদ আর সালেহা কোথায় ?

সেই মোটা মত ছেলেটা উঠে দাঁড়ায়। যাকে একদিন সাজ্জাদ তাড়া করেছিলো। ছেলেটির নাম ফারুক। ফারুক বলে উঠে—মাষ্টার সাহেব সাজ্জাদ আর সালেহা টিফিনের সময় রোজ এমনি করে খেলতে যায়।

অন্য একটি ছেলে দাঁড়িয়ে বলে—ওদের দু'জনার খুব ভাব জমেছে মাষ্টার সাহেব।

দাঁত মুখ খিচিয়ে বলে উঠেন মাষ্টার সাহেব—তাই নাকি ?

ফারুক পুনরায় বলে—মাষ্টার সাহেব—শুধু ভাব নয় মাষ্টার সাহেব দু'জনার মধ্যে……কথা শেষ না করে হাসা হাসি করে ওরা।

এমন সময় স্কুলে প্রবেশ করে সাজ্জাদ আর সালেহা।

মাষ্টার ওদের দু'জনকে দেখতে পেয়ে রাগে ফেটে পড়েন। গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—এদিকে শোন।

সাজ্জাদ আর সালেহা মাষ্টার সাহেবের মুখ ভাব লক্ষ্য করে শিউরে উঠে। ভীত ভাবে এগিয়ে যায় সাজ্জাদ মাষ্টার সাহেবের দিকে।

সালেহা আসন গ্রহণ করছিলো তাকেও ডাকেন মাষ্টার সাহেব। সালেহা তুমিও শোন।

সালেহা ভীত দৃষ্টি নিয়ে তাকায় মাষ্টার সাহেবের মুখের দিকে তারপর অনুসরণ করে সাজ্জাদকে।

মাষ্টার সাহেবের টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় সালেহা আর সাজ্জাদ।

মাষ্টার সাহেব গর্জে উঠলেন—রোজ টিফিনের সময় কোথায় যাও তোমরা।

ফারুক বলে উঠে—মাষ্টার সাহেব কোন কোন দিন সাজ্জাদ আর সালেহা টিফিনের পর স্কুলেই আসে না।

এ্যাঁ কি বললি ? টিফিনের পর স্কুলেই আসেনি। বটে, তারপর সাজ্জাদ আর সালেহাকে লক্ষ্য করে বলেন—যা-জায়গায় গিয়ে বস্। বিচার হবে পরে।

সাজ্জাদ আর সালেহার মনে ঝড় বইছে না জানি আজ তাদের অদৃষ্টে কি আছে। মাষ্টার সাহেব যখন তাদের নিজের জায়গায় গিয়ে বসবার জন্য আদেশ দিলেন তখন কতকটা আশ্বস্ত হলো তারা।

নিজ নিজ জায়গায় গিয়ে বসে সাজ্জাদ আর সালেহা যদিও তারা মাষ্টার সাহেবের বেতের আঘাত থেকে উপস্থিত রক্ষা পেলো কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত হলোনা। মনের কোনে একটা দুঃভাবনার কালো মেঘ জমাট বেধে উঠলো।

সাজ্জাদ আর সালেহাকে মাষ্টার সাহেব বকা দিয়েছে বলে স্কুলের অন্যান্য ছেলে মেয়েরা মুখ টিপে হসাহাসি করতে লাগলো।

সালেহা মাথা নত করে বসে রইলো।

সাজ্জাদ কিন্তু দমবার পাত্র নয়, সে দীপ্ত মুখেই বসে বইমেলে পড়তে শুরু করলো।

ছেলে মেয়েরা তখনও হাসা হাসি করছে।

এক সময় স্কুল ছুটি হয়ে যায়।

যার যার বাড়ীর পথে এগিয়ে যায় ছেলে মেয়েরা।

তমিজ উদ্দিন সাহেব বৈঠক খানায় একটা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করছিলেন, এমন সময় বয় এসে বলে স্যার একজন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

এখানে নিয়ে আয়। বললেন তমিজ উদ্দিন সাহেব। বয় বেরিয়ে যায় একটু পরে আগন্তক সহ ফিরে আসে।

তমিজ উদ্দিন সাহেব সোজা হয়ে বসেন—মাষ্টার সাহেব যে ব্যাপার কি ?

ছালাম জানিয়ে আসন গ্রহণ করেন মাষ্টার সাহেব।

তমিজ উদ্দিন সাহেবের বাড়ীতে আজ তিনি প্রথম এসেছেন। অবশ্য বাড়ীতে প্রথম আসলেও আগে থেকেই পরিচয় ছিলো উভয়ের মধ্যে।

সাজ্জাদকে স্কুলে ভর্তি করবার সময় তাদের মধ্যে হয়েছিল প্রথম পরিচয়। তারপর অনেক জায়গায় মাষ্টারের সঙ্গে তমিজ উদ্দিনের সাক্ষাৎ ঘটেছে, কাজেই পরিচয় তাদের পূর্ব থেকেই ছিলো।

তমিজ উদ্দিন সাহেব একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বলেন, খবর কি মাষ্টার সাহেব ?

মাষ্টার এতোক্ষণে মাথা চুলকে বললেন—একটা কথা আপনাকে জানাতে এসেছি।

বলুন ? ভালভাবে ঠেশ দিয়ে বসে বললেন তমিজ উদ্দিন।

মাষ্টার একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলেন—আপনার ছেলে সাজ্জাদ সম্বন্ধে একটি কথা আছে। যদি কিছু মনে না করেন।

না না, আপনি বলুন ?

আপনার সম্মান এখানে অনেক বেশী। আপনি আমাদের গ্রামের একজন শিক্ষিত, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান লোক। আপনাকে আমরা সবাই অনেক শ্রদ্ধা করি।

হাঁ তা করেন। কিন্তু আসল কথাটা কি এবার বলুন দেখি ?

কথাটা তেমন বড় নয় তবে মারাত্মক।

তার মানে ? সোজা হয়ে বসেন তমিজ উদ্দিন সাহেব। দু'চোখে তার প্রশ্নভরা চাহনী। কি বলতে চায় মাষ্টার। তার বালক সন্তান সম্বন্ধে এমন কি নালিশ রয়েছে, ভেবে পান না তিনি।

মাষ্টার সাহেব এবার ভূমিকা ছেড়ে সোজা ভাষায় বলে উঠেন—সাজ্জাদ স্কুলে গিয়ে ভাল ভাবে পড়া শোনা করে না।

এই কথা ?

না শুনুন। সে আমাদের স্কুলের একটা গরীব দুঃখিনীর মেয়ের সঙ্গে মেলা মেশা করছে। শুধু মেলা মেশাই নয় জনাব এমন কি টিফিনের সময় ওরা দু'জনা বেরিয়ে যায়—আর ক্লাশই করে না।

রাগে গর্জে উঠেন তমিজ উদ্দিন সাহেব—এ কথা সত্যি ?

সত্যি না হলে আমি এসেছি। দেখুন জনাব আপনার ছেলে তার সম্মান আলাদা, সে কেনো একটা ভিখারীর মেয়ের সঙ্গে .....।

থাক্ আর বলতে হবে না মাষ্টার সাহেব আমি সব বুঝতে পেরেছি। আমি ওর ব্যবস্থা করবো।

তা হলে আমি চলি?

অন্যমনস্ক ভাবে বলে উঠেন তমিজ উদ্দিন সাহেব—আচ্ছা।

মাষ্টার সাহেব বেরিয়ে যান।

তমিজ উদ্দিন উঠে পায়চারী শুরু করেন। এক মাত্র সন্তানের জন্য তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। মাষ্টার যা বলে গেলেন সেটা ফেলবার কথা নয়। তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি। একজন অফিসার। তার ছেলে মিশবে একটা দীন দুঃখী মেয়ের সঙ্গে। তমিজ উদ্দিন সাহেবের আত্মমর্য্যাদায় প্রচণ্ড আঘাত লাগে। এখনও প্রচুর সময় আছে। সাজ্জাদকে এখান থেকে সরাতে হবে।

তিনি গম্ভীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন অন্দর বাড়ীর দিকে। পুত্রের কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন সাজ্জাদ চেয়ারে বসে পড়া শোনা করছে।

ডাকলেন তমিজ উদ্দিন সাহেব—সাজ্জাদ!

পিতার কণ্ঠস্বরে চমকে ফিরে তাকালো সাজ্জাদ। বিশেষ করে আজ পিতার গলার স্বরে এমন একটা ভাব ফুটে উঠেছে, যার মধ্যে নেই এতোটুকু স্নেহের আভাস।

উঠে দাঁড়িয়ে বললো সাজ্জাদ—আমায় ডাকছো আব্বা?

হাঁ শোন। আমি মাষ্টারের মুখে শুনলুম তুমি নাকি সালেহা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করতে শুরু করেছো?

সাজ্জাদ নীরব।

পুনরায় হুঙ্কার ছাড়েন তমিজ উদ্দিন সাহেব—সাজ্জাদ তোমাকে লেখা পড়া শিখবার জন্য স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি। তুমি প্রায়ই নাকি টিফিনের পর স্কুলে যাওনা। এতো বড় সাহস তোমার কি করে হলো। যাক্ এবার তুমি শহরে যাও। আমি তোমাকে শহরের স্কুলে ভর্তি করে দেবো।

অসহায় দৃষ্টিনিয়ে একবার পিতার মুখের দিকে তাকায় সাজ্জাদ। কোন কথা বলতে পারে না।

একটু থেমে পুনরায় বলেন তমিজ উদ্দিন সাহেব—আমারও বদলির কথা হচ্ছে। যা হোক আমার এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত জেনো। তোমার মা বেঁচে থাকলে-তোমাকে মানুষ করার ব্যাপারে হয়তো আমাকে এতো চিন্তা করতে হতো না।

কথাগুলি বলে রাগত ভাবে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান তমিজ উদ্দিন সাহেব।

সাজ্জাদ নির্ব্বোধের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার ক্ষুদ্র মনের আকাশে ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়েছে। আগের দিন স্কুলে মাষ্টার সাহেবের কথাগুলি স্মরণ হয় তার। সালেহার মুখ খানাও মানস পটে ভেসে উঠে সাজ্জাদের।

নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে, ধ্যান গ্রস্থের মত সাজ্জাদ।

ও পাশের দরজায় খুট্ করে শব্দ হয়।

সাজ্জাদ ফিরে তাকায়।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মান্নান তাকে হাতের ইশারায় ডাকছে।

সাজ্জাদ এগিয়ে যায় মান্নানের পাশে।

মান্নান সাজ্জাদের কানে মুখ নিয়ে কিছু বলে। তারপর ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণ পূর্বে পিতার কঠিন কণ্ঠ স্বরে সাজ্জাদের হৃদয়ে যে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিলো-মান্নানের স্নেহময় পরশে সে ব্যথা-অনেকটা লাঘব পায়। কিন্তু চোখ দুটো কেমন যেন ছল ছল, করে উঠে তার।

মান্নান ওকে নিবিড় করে টেনে নেয় কাছে।

আজ ক'দিন থেকে সালেহার নানীর অসুখ। খুব বেশী জ্বর হয়েছে। বুড়ো মানুষ, একেই তিনি ক্ষীণদূর্ব্বল। তারপর এক'দিনের অসুখে একেবারে শয্যা শায়ী হয়ে পড়েছেন।

নানীর অসুখের জন্য সালেহার চিন্তার অন্ত নেই। ছোট বেলায় বাবা মাকে হারিয়ে নানীকেই সে গভীর ভাবে ভালবেসে ফেলেছে। পিতার আদর, মায়ের স্নেহ সবই সে পেয়েছে নানীর কাছে। সেই স্নেহময়ী নানী আজ অসুস্থা।

সালেহার মনে শান্তি নেই। ঘরের দাওয়ায় বসে কি যেন করছিলো।

এমন সময় মান্নানের গলা শোনা যায়—সালেহা।

সালেহা উঠে দাঁড়িয়ে তাকায়—তোমার নানী কেমন আছে সালেহা।

ভাল নেই। জ্বর আছে। কাদের ডাক্তারের ওষুধ এনে দিয়েছি।

মান্নান এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে—ছোট সাহেব আজ চলে যাচ্ছে। এই কাগজের নৌকাটা সে তোমায় দিয়ে গেছে।

মুহূর্তে সালেহার মুখমণ্ডল বিষণ্ণ মলিন হয়ে উঠে। স্তব্ধ কণ্ঠে বলে—সাজ্জাদ ভাই চলে যাচ্ছে? কোথায় যাচ্ছে সে মান্নান ভাই বলো না?

শহরে। বড় সাহেব তাকে শহরের স্কুলে ভর্তি করে দেবেন।

শহরের স্কুলে?

হাঁ। আমি এখন চললুম সালেহা। মান্নান বেরিয়ে যায়।

সালেহা পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে সে সাজ্জাদের দেওয়া কাগজের নৌকা খানা। গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে আসে দু'ফোটা অশ্রু।

এমন সময় কুটিরের ভিতর থেকে নানীর গোঙ্গানীর শব্দ ভেসে আসে।

সালেহা তাড়াতাড়ি ছুটে যায় কুটিরের মধ্যে।

নানীর বিছানার পাশে গিয়ে বসে সালেহা—নানী-নানী।

কি বোন?

অমন করে কোকাচ্ছো কেনো ? নানীর মাথায় হাত রেখে বলে সালেহা—ইস্ কি গরম ! মাথাটা তোমার পুড়ে যাচ্ছে।

একটু পানি দে সালেহা।

দিচ্ছি, সালেহা তাড়াতাড়ি এক গেলাস পানি এনে বৃদ্ধার মুখে ধরে।

নানী এক নিশ্বাসে খানিকটা পানি খেয়ে চোখ বন্ধ করে। সালেহা ধীরে ধীরে নানীর মাথায় বুকে হাত বুলিয়ে চলে।

কিছুক্ষণ কেটে যায়। নানী বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে।

সালেহা একটা পানির গামলা টেনে তার মধ্যে সাজ্জাদের দেওয়া কাগজের নৌকা খানা ভাসিয়ে দেখতে থাকে। মনে পড়ে সাজ্জাদ বলেছিলা কাগজের নৌকাখানার মধ্যে যাদু আছে। কই যাদু কোথায়।

সালেহা ভিজে নৌকাখানা হাতে তুলে নিয়ে দেখতে থাকে। হঠাৎ তার নজরে পড়ে যায় কাগজের নৌকাখানার গায়ে লেখা রয়েছে "সালেহা"

লেখাটা সালেহার মনকে চঞ্চল করে তুললো।

উঠে দাঁড়ায় সালেহা, ভুলে যায় সে নানীর কথা। ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। সত্যি তার সাজ্জাদ চলে যাবে। তাকে ছেড়ে চলে যাবে শহরে। ছুটতে থাকে সালেহা।

ঘাটে নৌকা বাঁধা রয়েছে।

চাকর বাকর সবাই ব্যস্ত হয়ে নৌকায় সাজ্জাদের বেডিং পত্র উঠিয়ে দিচ্ছে। মান্নান একটা স্যুটকেস হাতে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে সাজ্জাদ। মুখ মণ্ডল ভাবাপন্ন গম্ভীর আষাঢ়ে মেঘের মতই থম থমে। চোখ দুটো কেমন ছলছল করছে।

মাঝি মাল্লারা সবাই প্রস্তুত হয়ে নৌকায় গিয়ে যে যার জায়গায় দাঁড়িয়েছে।

এমন সময় গ্রামের ডাক্তার কাদের সাহেব এসে হাজির হন সেখানে। তমিজ উদ্দিন সাহেবকে লক্ষ্য করে বলেন—কোথায় যাওয়া হচ্ছে সি, ও সাহেব ?

না আমি যাচ্ছি না আমার ছেলে সাজ্জাদ যাচ্ছে। ওকে এবার শহরের স্কুলে ভর্তি করবো।

বেশ বেশ, এই গ্রাম অঞ্চলে কি ছেলে মেয়ে মানুষ করা যায় যত সব ভুতের আড্ডা।

তমিজ উদ্দিন সাহেবের হঠাৎ মনে পড়ে যায় ক'দিন আগে সাজ্জাদের একটু সর্দ্দী জ্বর হয়েছিলো। এই কাদের ডাক্তারের নিকট থেকেই ঔষধ এনেছিলো মান্নান। দামটা এখনও দেওয়া হয়নি। তিনি বলে উঠেন—ডাক্তার সাহেব আপনার ওষুধের দামটা পাঠিয়ে দেবো।

না-না ওষুধের দাম···সে থাক্ পরে যখন হয় দেবেন। আচ্ছা এখন তা হলে চলি ?

আসুন।

ডাক্তার কাদের পথের বাঁকে অদৃশ্য হন।

তমিজ উদ্দিন সাহেব মান্নানকে লক্ষ্য করে বলেন—মান্নান ঐ চিঠিতেই সব লিখে দিয়েছি। ওর ফুফার ওখানেই থাকবে। গিয়েই পৌঁছার সংবাদ দেবে। যাও আল্লার নাম স্মরণ করে রওয়ানা হও।

সাজ্জাদ পিতার পাশে এসে কদমবুসী করে উঠে দাঁড়ায়।

তমিজ উদ্দিন পুত্রকে লক্ষ্য করে এবার বললেন, শহরে গিয়ে দুষ্টামি কোরনা। লেখা পড়ায় মন দিও। তার পর মাঝিদের উদ্দেশ্যে বললেন—ছাড়ো মাঝি ভাই। চালিয়ে যেও ষ্টীমার যেন ফেল না হয়।

সাজ্জাদ আর মান্নান নৌকার মধ্যে চেপে বসে।

মাঝি নৌকা ছাড়ে।

দাঁড় আর লগির ঝুপ ঝাপ শব্দের তালে তালে নৌকা এগিয়ে চলে।

তমিজ উদ্দিন সাহেব রুমালে চোখ মোছেন। সাজ্জাদই যে তার আশা ভরসা স্বপ্ন সাধ। সাজ্জাদই তার সব। একমাত্র সন্তানকে বিদায় দিতে গিয়ে তমিজ উদ্দিন সাহেব হৃদয়ে দারুণ ব্যাথা অনুভব

করেন, কিন্তু কোন উপায় নেই। ছেলেকে যে তার মানুষ করতেই হবে।

সাজ্জাদ লেখা পড়া শিখবে মানুষ হবে, মস্ত বড় হবে সে, এটাই তো তাঁর কামনা।

কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টি মেলে নৌকা খানার দিকে তাকিয়ে থেকে ফিরে চলেন তিনি বাড়ীর দিকে।

সাজ্জাদ নৌকার পিছনে বসে তাকিয়ে আছে তীরের দিকে ঘাট ছেড়ে তাদের নৌকা সরে যাচ্ছে দূরে আরও দূরে। উদ্বিগ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকায় সাজ্জাদ বার বার তীরের দিকে। একটি বার সালেহা যদি আসতো…

হঠাৎ সাজ্জাদের নজরে পড়ে সালেহা তীর ধরে দৌড়াচ্ছে। হাত তুলে ডাকছে—সা-জ্জা-দ। সা-জ্জা-দ……

নৌকা তখন সাজ্জাদকে নিয়ে অনেক দূরে সরে গেছে।

সাজ্জাদ সালেহার ডাক শুনতে পায়, চট্ করে বেরিয়ে আসে ছৈ' এর বাইরে। ছৈ-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়ায় সে।

সালেহা তখন দৌড়াচ্ছে আর আকুল কণ্ঠে ডাকছে—সাজ্জাদ-সাজ্জাদ…

সাজ্জাদের দু'চোখ পানিতে ভরে আসে, হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানায় সে সালেহাকে।

সালেহা দাঁড়িয়ে পড়ে। স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে সাজ্জাদের দিকে, সাজ্জাদ তখনও হাত নাড়ছে।

সালেহার তৈল বিহীন চুলগুলি বাতাসে উড়ছে। দু'গোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোটা ফোটা অশ্রু।

ধীরে ধীরে নদীর বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায় সাজ্জাদের নৌকা খানা।

হাতের পিঠে চোখের পানি মুছে ফিরে দাঁড়ায় সালেহা, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে সে।

সন্ধ্যার আকাশ তখন ঝাপসা হয়ে এসেছে।

সালেহা বাড়ীর পথে পা বাড়ায়।

সাজ্জাদ চলে যাবার পর কেটে গেছে কয়েকটা দিন।

সালেহার নানীর অসুখ ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। সালেহা দুদিন কাদের ডাক্তারের নিকট হতে ঔষধ এনে দিয়েছিলো নানীকে। কিন্তু অসুখ এতোটুকু কমেনি, বরং বেড়েই গেছে।

নানীর সেবা যত্ন করার পর নিয়মিত স্কুলে যায় সালেহা। ক'দিন পর তাদের স্কুলে পরীক্ষার ফলাফল বের হবে। কত স্বপ্ন এঁকেছিল সালেহা নিজের মনে। এবার সাজ্জাদ আর সালেহা পাশ করলে নতুন ক্লাশে উঠবে, কত আনন্দ। মুক্ত বিহঙ্গমের মত ডানামেলে উড়ে বেড়াবে ওরা নীল আকাশে। সব আশা সব বাসনা সালেহার মুছে গেছে। সাজ্জাদ চলে যাওয়ায় সঙ্গীহারা হয়ে পড়েছে সে।

স্কুলে যায় বটে সে, কিন্তু মনে তার এতোটুকু প্রফুল্লতা নেই। ফুলের মত সুন্দর মুখ খানা মুষড়ে পড়েছে। সব সময় কেমন যেন বিষণ্ন ভাবাপন্ন। ক্লাশে গিয়ে এক পাশে জড়ো সড়ো হয়ে বসে থাকে সালেহা।

স্কুলের ছেলে মেয়েরা ওকে লক্ষ্য করে টিপ্পনী কাটে। এ ওর কাণে মুখ নিয়ে কি যেন বলাবলি করে হাসা-হাসি করে।

সালেহা কোন দিকে না তাকিয়ে নিশ্চুপ বসে থাকে।

যেদিন ফলাফল বের হলো স্কুলে সেদিন দেখাগেলো সালেহা ফাষ্ট হয়ে পাশ করেছে।

ক্লাশের ছেলে মেয়েরা হিংসায় মুখ চাওয়া চাওয়ী করে। তারা মনে করেছিলো সালেহা এবার পাশই করতে পারবেনা। কিন্তু সালেহা যখন সবাইকে চমকে দিয়ে ক্লাশে ফাষ্ট হলো তখন স্কুলের মাষ্টারগণ পর্যন্ত বিস্মিত হলেন।

এতো আনন্দের মধ্যেও সালেহা খুশী হতে পারলো না। সাজ্জাদের কথা মনে হওয়ায় দু'চোখ বার বার ঝাপসা হয়ে আসতে লাগলো।

কিন্তু নানীর কথা মনে হতেই ছুটলো সে বাড়ীর পথে। তার নানীর কত কত আশা সালেহা পাশ করে উপরের ক্লাশে উঠবে। কত দিন সালেহার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছেন—সালেহা তুই লেখা পড়া শিখবি। মোটা মোটা বই পড়বি। আমি চেয়ে চেয়ে দেখবো।

সালেহা আজ ক্লাশে ফাষ্ট হয়েছে, এযে তার নানীর কাছে কত বড় আনন্দের সংবাদ জানে সে। প্রোগ্রেস রিপোর্ট হাতে ছুটছে সালেহা। উঠানে প্রবেশ করে ডাকে সে—নানী নানী আমি ফাষ্ট হয়ে পাশ করেছি। আমি ফাষ্ট হয়ে পাশ করেছি.....

কক্ষে প্রবেশ করে ঝুকে পড়ে সালেহা নানীর মুখের উপর—নানী আমি ফাষ্ট হয়েছি.....

কিন্তু নানীর চোখ তখন বড় বড় হয়ে উঠেছে। কেমন যেন নিশ্বাসটা দ্রুত বইছে।

ভয় পায় সালেহা। কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—নানী তুমি অমন করছো কেনো ?

নানী কিছু বলতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না। জড়িয়ে আসে তাঁর কণ্ঠস্বর।

সালেহা বুঝতে পারলো নানীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এক্ষুণি ডাক্তার ডাকতে হবে। নানীকে যেমন করে হোক বাঁচাতেই হবে। সালেহা প্রোগ্রেসরিপোর্ট খানা তাকের উপর রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটতে থাকে।

উঠি পড়ি করে ছুটছে সালেহা। কোন্ দিকে তার খেয়াল নেই।

অদূরে একটা শুকনো গাছ কাটছেন তৈমুর চাচা, সঙ্গে কয়েক জন লোক রয়েছে। কুড়াল দিয়ে গাছের গোড়া কাটছিলো তারা। গ্রামের মধ্যবিত্ত লোক তিনি, যেমন মহৎ তেমনি উদার, এই তৈমুর চাচা। সরল স্বাভাবিক মানুষটি। কিন্তু তার স্ত্রী তেমনি ঝগড়াটে, কলহ প্রিয়া। সব সময় তৈমুর চাচার সঙ্গে এটা ওটা নিয়ে লেগেই আছে। পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গেও তার ভাব নেই। এহেন স্ত্রীর স্বামী তৈমুর চাচা।

তৈমুর চাচা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, তার লোক গাছটার গোড়া কাটছিলো।

সেই পথে সাইকেলে চেপে এগিয়ে আসছিলেন কাদের ডাক্তার।

সালেহা তাকে দেখতে পেয়ে পথ আগলে দাঁড়ায়। কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলে—ডাক্তার সাহেব আমার নানী আর বাঁচবে না। কেমন করছে। একবার চলুন ডাক্তার সাহেব।

সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াল কাদের ডাক্তার। দাঁত মুখ খিচিয়ে বলেন—তা আমি কি করবো? আমি গেলেই তোর নানী বেঁচে উঠবে? ওষুধের দাম দিতে পারিস না। বাড়ী গেলে ভিজিটের টাকা দিতে পারবি?

সালেহা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠে—নানী সেরে উঠলেই আপনার টাকা দিয়ে দেবো।

নগদ টাকা না হলে আমি যাবো না। সরে যা আমার পথ ছাড় বলছি।

না না, যাবেন না ডাক্তার সাহেব, যাবেন না। আমার নানীকে বাঁচান। বাঁচান ডাক্তার সাহেব। সালেহা কাদের ডাক্তারের হাত চেপে ধরে।

ডাক্তার ওকে ঠেলে সরিয়ে দেয়—পথ ছাড়! আমার তাড়া আছে। কাজীপুর জমিদার বাড়ী যেতে হবে। সরে দাঁড়া।

সালেহাকে সরিয়ে দিয়ে সাইকেলে চেপে চলেযায় কাদের ডাক্তার। সালেহা ডাক্তারের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে অশ্রু বিসর্জন করে।

তৈমুর চাচা দূর থেকে লক্ষ্য করেন সালেহা আর কাদের ডাক্তারের ব্যাপারটা। এগিয়ে আসেন—কি হয়েছে মা?

তৈমুর চাচার স্নেহ ভরা কথায় সালেহার রুদ্ধ কান্না বাঁধ ভাঙ্গা স্রোতের মত বেরিয়ে আসে। তৈমুর চাচাকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছসিত ভাবে কেঁদে উঠে—নানী আর বাঁচবে না। আমার নানী আর বাচবে না চাচা.....

ডাক্তার কি বললো মা? সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তৈমুর চাচা।

সালেহা হাতের পিঠে চোখের পানি মুছতে মুছতে বলে টাকার জন্য ডাক্তার সাহেব গেলেন না।

তৈমুর চাচার মুখ মণ্ডল গম্ভীর হলো, তিনি বললেন ও ডাক্তার নয় মা, ও কষাই। রোগীর সেবা ও জানে না, জানে শুধু পয়সা।

চাচাজান নানী একা আছেন। আমি নসু কবিরাজকে ডেকে আনি।

আচ্ছা মা, আমি তোদের বাড়ী যাচ্ছি। তারপর নিজের লোকদের ডেকে বললেন তৈমুর চাচা—ওরে তোরা একটু গা লাগিয়ে কেটে যা আমি আসছি।

তৈমুর চাচা সালেহাদের বাড়ীর দিকে রওয়ানা দেন।

সালেহা আবার ছুটতে শুরু করে।

মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্যের তাপ, গা ঘেমে ভিজে চুপসে উঠছে পায়ের নীচে মাটি আগুনের মত গরম হয়ে উঠেছে। সালেহার কচি পা পুড়ে যাচ্ছে যেন, তবু কোন দিকে খেয়াল নেই। ছুটছে সালেহা।

নসু কবিরাজকে নিয়ে সালেহা ব্যস্ত ভাবে উঠানে প্রবেশ করে।

কিন্তু বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ায় সালেহা। বাড়ী ভর্তি লোকজন দেখতে পায়। সকলেরই মুখমণ্ডল গম্ভীর থমথমে। চোখগুলি অশ্রু ছল ছল।

কেউ কেউ মাথা নত করে বসে আছে। কেউবা আঁচলে চোখের পানি মুছছে।

তৈমুর চাচা মাথা নীচু করে দাওয়ার এক পাশে বসেছিলেন। সালেহার পিছনে নসু কবিরাজকে আসতে দেখে তিনি বলে উঠেন—বড্ড দেরী হয়ে গেছে নসু।

নসু কবিরাজ উঠানে প্রবেশ করেই বুঝতে পেরেছিল সালেহার নানী আর নেই। কারণ তৈমুর চাচা এবং অন্যান্যের মুখ ভাবেই

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো ব্যাপারটা। তবু তৈমুর চাচাকে জিজ্ঞাসা করে কবিরাজ—কি হলো ?

সালেহার নানী আর নেই।

সঙ্গে সঙ্গে কবিরাজ সাহেব উচ্চারণ করলেন—ইন্না লিল্লাহে... ...রাজেউন।

সালেহা ছুটে যায় ঘরের মধ্যে—নানী—নানী—নানী কিন্তু কে দেবে সাড়া নানী তখন চলে গেছেন পরপারে।

সালেহা নানীর বুকে আছাড় খেয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে। বাড়ীটার আকাশ বাতাস সালেহার করুন ক্রন্দনে ভরে উঠে।

তৈমুর চাচা সালেহাকে বুকে টেনে নিয়ে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেন। তার চোখের পানি ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে বালিকা সালেহার মাথায়।

কিন্তু যে জন গেছে সে তো আর ফিরে আসবে না। কাজেই তৈমুর চাচা পাড়া প্রতিবেশীদের সাহায্যে সালেহার নানীর সৎ কাজে লিপ্ত হন।

সালেহার নানীর সৎকাজ শেষ করে যখন তৈমুর চাচা ফিরে এলেন, তখন সালেহা দাওয়ার খুটিতে ঠেশ দিয়ে বসে নীরবে কাঁদছিল গোটা বাড়ীটায় কেমন যেন থম থম ভাব বিরাজ করছে।

বাড়ীর দক্ষিণ ধারের আমগাছটায় বসে একটা কাক অবিরত কা-কা করে চলছে, নীরস কঠিন আওয়াজ। সালেহা এলো মেলো চুলে বসেছিলো। মুক্তার মত ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ছিলো তার কোলের উপর।

তৈমুর চাচা উঠানে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়ালো। সালেহার করুণ অবস্থা তাঁর হৃদয়কে বিদীর্ণ করে দেয়। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকেন তিনি—মা সালেহা।

চোখ তুলে তাকায় সালেহা।

তৈমুর চাচাও নীরবে তাকিয়ে থাকেন।

হঠাৎ সালেহা তৈমুর চাচাকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছসিত ভাবে কেঁদে উঠে। রুদ্ধ কণ্ঠে বলে সে—চাচাজান আমি ডাক্তার হবো। আমি ডাক্তার হবো। আমি ডাক্তার হবো।

তৈমুর চাচা কাধের গামছায় চোখের পানি মুছে বলেন—ডাক্তার হবি মা। সেতো অনেক লেখাপড়া করতে হয়।

আমি তাই করবো। আমি তাই করবো চাচাজান। আমি ডাক্তার হবো.....

তৈমুর চাচা সালেহাকে একা ফেলে যেতে পারলেন না। তিনি সালেহাকে সঙ্গে করে নিয়ে চললেন নিজের বাড়ীতে। বগলে সালেহার কাপড় চোপড়ের পুট্‌লি। দক্ষিন হস্তে সালেহার হাতধরে এগুলেন তৈমুর চাচা।

সালেহাকে নিয়ে তৈমুর চাচা যখন বাড়ীর দরজায় এসে পৌছলেন ঠিক সেই মুহূর্তে তৈমুর চাচার স্ত্রী হাতে কাপড় চোপড় নিয়ে পুকুর ঘাঠের দিকে যাচ্ছিলো। সঙ্গে তার ছেলে নাসের ও আছে।

তৈমুর স্ত্রীকে লক্ষ্যকরে বলেন—শুনছো—

দাড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকায় তৈমুর চাচার স্ত্রী। স্বামীর সঙ্গে সালেহাকে দেখে কিছুটা আশ্চর্য হয়। বলে—কি বলছো শুনি ?

শুনেছো সালেহার নানী মারা গেছে ?

শুনেছি। তা কি বলছো আমাকে ?

বলছি, ওর আর কেউতো নেই। ঐ নানীই ছিলো একমাত্র সম্বল.....

তা জানি। কি বলবে চট্‌করে বলো ?

এখন থেকে সালেহা আমাদের বাড়ীতে থাকবে। মুখ কাঁচু মাচু করে কথাটা বললেন তৈমুর চাচা।

ভালই করেছো। জঞ্জাল বাড়িয়ে আমাকে শাস্তিদেবে এইতো। দেখো নাসেরের মা মেয়েটা লেখা পড়া শিখতে চায়।

খেকিয়ে উঠে তৈমুর চাচার স্ত্রী—মেয়েছেলের আবার লেখাপড় শিখার ঢং। কি হবে লেখাপড়া শিখে ?

সে তুমি বুঝবেনা নাসেরের মা। যা মা সালেহা তুইও গোসলটা সেরে আয়।

দরদ দেখো। কত আর ঢং দেখবো। নাসেরকে সঙ্গে করে ঘাঠের দিকে চলে যায় তৈমুর চাচার স্ত্রী।

তৈমুর চাচা ভাবতে থাকেন, কি করলেন সালেহাকে এনে তিনি ভাল করলেন না মন্দ করলেন।

সালেহার প্রতি স্ত্রীর বিরক্ত ভাব তাঁকে ব্যথিত করে তোলে। শেষ পর্যন্ত এর পরিনতি যে কি দাঁড়াবে ভেবে অস্থির হন তিনি। কিন্তু কি করবেন, কোথায়ই বা ফেলবেন মেয়েটাকে। তাছাড়া সালেহা তাঁর পর নয়। মামাতো ভাইয়ের মেয়ে সালেহা।

একদিন সালেহার পিতা কলিমুদ্দিনের অবস্থাও খুব ভাল ছিলো। গ্রামের মধ্যে একজন নামকরা লোক ছিলেন তিনি। অনেক জমি জায়গা, ঘড় বাড়ী সব ছিল তাদের। কিন্তু কালের কঠোর নিস্পেষনে আজ তারা সর্বহারা।

প্রকৃতির এই নির্ম্মম কষাঘাত মাথাপেতে নেবার জন্য আজ কলিমুদ্দিন বেচে নেই। বেচে নেই তার স্ত্রী জরিনা খাতুন। একমাত্র নানী সংসারের দাবানলে দগ্ধিভুতাহয়েও নাতনী সালেহাকে বুকে আঁকড়ে এতোদিন বেঁচে ছিলেন। আজ তিনিও চলে গেলেন। সংসারের সমস্ত ঝড় ঝঞ্ঝা পোহাবার জন্য রইলো সালেহা।

তৈমুর চাচা সালেহাকে নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। যা হোক, যেমন করেই হোক মেয়েটাকে তিনি লেখাপড়া শেখাবেন। মানুষ করবেন।

কিন্তু কয়েকদিন যেতেই সালেহার অবস্থা চরমে উঠলো।

তৈমুর চাচার স্ত্রী নির্ম্মম অত্যাচার শুরু করলেন সালেহার উপর। খেতে বসতে সব সময় গাল মন্দ করতে লাগলো সে।

সালেহার কচিমন ব্যথায় জর্জ্জরিত হলো।

তৈমুর চাচা সব বোঝেন, সব দেখেন কিন্তু তিনি নিরুপায়। স্ত্রীর উপর তিনি কোন কথাই বলতে পারেন না।

সেদিন সালেহা কুয়ো তলায় বসে একরাশ বাসন মাজছিলো। তৈমুর চাচার স্ত্রী ঘরের ভিতর থেকে আঁচল দেখতে দেখতে বেরিয়ে আসে। সোজা কুয়ো তলায় গিয়ে সালেহাকে লক্ষ্য করে বলে—আমার আঁচলে পয়সা ছিলো।

সালেহা মুখ তুলে তাকায়—আমি দেখিনি চাচী আম্মা।

দেখোনি। পয়সা তবে গেল কোথায় ?

কুয়ো তলায় যখন তৈমুর চাচার স্ত্রী আর সালেহার কথা হচ্ছিলো তখন নাসের দরজায় আড়ালে লুকিয়ে লজেন্স চুষছে।

চাচী সালেহার কানধরে টেনে তোলে—পয়সা চুরি করে আবার মিথ্যা বলা হচ্ছে। ঠাঁস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় সে সালেহার গালে। তারপর বক্ বক্ করে বলতে থাকে—নিজেও অপয়া, একে একে গুষ্টির সবাইকে খেয়েছে। এসেছে আমাদের মাথা চিবিয়ে খেতে।

চাচী যখন সমস্ত বাড়ী মাথায় তুলে চেঁচা মেচি করছিলো ঠিক সেই মুহূর্তে তৈমুর চাচা ছাতা বগলে উঠানে প্রবেশ করেন। স্ত্রীর রনরঙ্গিণী মূর্তি এবং সালেহার অশ্রুভরা করুন মুখ দেখে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝেনেন। আজ এটা নতুন নয়। সালেহা এ বাড়ীতে আসার পর থেকেই সদা সর্বদা লেগেই আছে ঝগড়া আর চেঁচামেঁচি।

তৈমুর চাচা, ছাতাটা দাওয়ায় ঠেশদিয়ে রেখে বলে উঠেন এতো চেঁচাচ্ছো কেনো ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ?

কি বললে আমার মাথা খারাপ হয়েছে। পয়সা চুরি করেছে সে কথা বলতেও পারবো না।

পয়সা তোমার ছেলে নাসেরও তো নিতে পারে।

দরজার ওপাশ থেকে নাসের সব শুনছিলো। পিতার কণ্ঠস্বরে চুপি চুপি সে পালিয়ে যায়।

চাচী বলে উঠে—নাসের সেতো ওর খালার ওখানে গেছে। ঐ অপয়া মেয়েটাই তোমার আপন হলো আর তোমার নিজের ছেলে পর হয়ে গেলো। ওগো এমন কোন দিন দেখিনি……চোখে আচল চাপা দিয়ে কাঁদতে শুরু করে চাচী।

তৈমুর চাচা বিব্রত বোধ করেন। স্ত্রীকে কিছু বলবেন তারও উপায় নেই। বেগতিক দেখে পুনরায় ছাতা নিয়ে বেরিয়ে যান উঠান থেকে।

স্বামীকে বেরিয়ে যেতে দেখে চাচীর কান্না থেমে যায়। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে তাকায় সালেহার দিকে।

সালেহা তখন বাসন মাজা শুরু করেছে।

চাচী কঠিন কণ্ঠে গর্জে উঠে—বাসন মেজে রেখে সেদ্ধ কাপড়গুলি ঘাটে নিয়ে গিয়ে পরিস্কার করে ধুয়ে আন। শুধু বসে বসে ভাত গিললে চলবেনা। তাড়া তাড়ি হাত চালিয়ে কাজ কর্।

সালেহা বাসন মাজা কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়ায়। তারপর একগাদা কাপড় পিড়িতে করে মাথায় নিয়ে পুকুর ঘাটের দিকে এগিয়ে যায়।

অসহায়া সালেহার বড় কষ্ট হয়। এতোটুকু মেয়ে কি এতো কাজ করতে পারে। তবু নিরুপায় সে করতেই হবে এসব কাজ। নইলে চাচী খেতে দেবে না।

ঘাটে গিয়ে কাপড় কাঁচতে শুরু করে সালেহা।

এমন সময় সেই পথে বই নিয়ে কতকগুলি ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছিলো। তারা সালেহাকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। একজন সালেহাকে লক্ষ্য করে বলে—সালেহা স্কুলে যাবিনা?

সালেহা হাতের পিঠে চোখের উপর গড়িয়ে পড়া চুলগুলি সরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, তারপর ছেলেমেয়েদের লক্ষ্য করে বলে—না যাবোনা। এই কাপড়গুলো আমাকে কাঁচতে হবে।

ছেলেমেয়েরা চলে যায়।

সালেহা কাপড় কাঁচতে শুরু করে। দু'চোখ গড়িয়ে পড়ে তার ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

চাচীর নির্মম অত্যাচারে আর অত্যন্ত কাজের চাপে বালিকা সালেহার অসুখ হয়ে পড়লো। অসুখ শরীর নিয়েই কাজ করতে হয় তার। নাহলে খাওয়া বন্ধ।

সেদিন শরীরটা খুব বেশী খারাপ বোধ করলো সালেহা। শুয়ে আছে সালেহা। মনে পড়ছে কত কথা, সবচেয়ে বেশী মনে পড়ছে নানীর কথাটা। নানী বলেছিলো—শুঁড় দিয়ে কাজ করি, নই আমি
হাতী, পরের উপকার করি তবু খাই লাথী।

বলেছিলো সালেহা—কি নানী বলোনা ?

জবাব দিয়েছিলো নানী—ঢেঁকী।

সালেহা যখন নানীর কথা শুয়ে শুয়ে ভাবছে তখন চাচী এসে উপস্থিত হয়, সালেহাকে লক্ষ্য করে ঝঙ্কার দিয়ে উঠে—বলি নবাব নন্দিনীর মত ঘুমাবি, না উঠবি ?

সালেহা নীরবে শুয়ে থাকে, মুখ চোখ বিষন্ন মলিন। চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু।

চাচী পুনরায় তীব্র কণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠে—বলি বেলা কত হলো তবু ঘুমোবি ? হঠাৎ চাচীর দৃষ্টি চলে যায় সালেহার চোখে, চোখ মেলে রয়েছে সে, বুঝতে পারে সালেহা ঘুমিয়ে নাই। এবার এগিয়ে গিয়ে চুলের মুঠি ধরে টেনে তোলে—উঠ নবাব জাদী, কাজ করবি কখন ?

সালেহাকে মারতে দেখে নাসের দৌড় দেয়।

বাইরে হুকো খেতে খেতে কি যেন কাজের তদারক করছিলেন তৈমুর চাচা।

নাসের ছুটে গিয়ে দাঁড়ায় পিতার পাশে। ব্যস্ত ভাবে বলে—আব্বা, আব্বা সালেহাকে মা মারছে। খুব মারছে শীগ্‌গীর যাও।

বলিস কিরে। সালেহাকে খুব মারছে! হন্ত দন্ত হয়ে ভিতর বাড়ীতে প্রবেশ করেন তৈমুর চাচা।

চাচী তখন সালেহাকে বেদম চড় থাপ্পর লাগাচ্ছে।

তৈমুর চাচা ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠেন—আহা, এসব কি করছো! কি করছো! অসুস্থা মেয়েটাকে এমনি করে মারছো! তোমার কি একটু দয়া নেই?

মারবোনা, নবাব পুত্রী শুয়ে শুয়ে ভাত গিলবে। ও সব আমার কাছে হবেনা। কথাগুলি বলতে বলতে বেরিয়ে যায় চাচী।

তৈমুর চাচা এবার এগিয়ে এসে সালেহাকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন—বুঝেছি মা, তোকে আর এখানে রাখা চলবেনা। চল্ মা তোকে শহরে রেখে আসি। আমার জানাশোনা এক লোক আছে, তাকে ধরে দেখি তোর কোন একটা ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।

তৈমুর চাচা একদিন সালেহাকে নিয়ে শহরের পথে রওয়ানা দিলেন।

নৌকায় করে ষ্টীমার ঘাটে গিয়ে পৌঁছলেন।

সালেহা কোনদিন ষ্টীমার দেখে নাই। অবাক হয়ে দেখতে লাগল সব। এত লোকজনও সে দেখে নাই, চারিদিকে তাকাচ্ছে সালেহা।

তারপর ষ্টীমারে উঠে আরও অবাক হয়।

তৈমুর চাচা সালেহাকে নিয়ে রেলিংএর ধারে গিয়ে দাঁড়ায়।

এমন সময় কয়েকজন দুষ্ট লোক সালেহা আর তৈমুর চাচাকে লক্ষ্য করে।

তৈমুর চাচা সালেহাকে কাছে টেনে নিয়ে বলেন—এখানে আমার পাশে থাকো মা।

ষ্টীমারের হুইসেল বেজে উঠে।

সালেহা তৈমুর চাচাকে-আঁকড়ে ধরে।

তৈমুর চাচা হেসে বলেন—কোন ভয় নেই মা। কোন ভয় নেই।

স্টীমার চলছে। স্টীমারের পাশ কেটে ছুটে চলা পানির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তৈমুর চাচা আর সালেহা। কল কল ছল ছল করে পানি ছুটছে।

এক সময় স্টীমার ঘাটে পৌঁছে গেলো।

জলস্রোতের মত লোক নামছে। অসম্ভব-ভীড়।

ভীড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে তৈমুর চাচা আর সালেহা। স্টীমার থেকে নামছে তারা।

পূর্বের সেই দুষ্ট লোকগুলি কিন্তু এখনও তাদের পিছু ছাড়েনি। তৈমুর চাচা আর সালেহাকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য দুষ্ট লোকগুলি এক সঙ্গে ভীড়ের মধ্যে ঠেলা ঠেলি শুরু করে।

এক জন ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় সালেহাকে। সালেহা ভীড়ের চাপে কোথায় হারিয়ে যায়, তৈমুর চাচা আর তার সন্ধান পান না।

সালেহাকে দেখতে না পেয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকা ডাকি শুরু করেন তৈমুর চাচা—সালেহা...সালেহা...সালেহা...

লোকের ভীড়ের মধ্যে সালেহাও খোঁজে তৈমুর চাচাকে। দু'চোখে ভয় বিহবল দৃষ্টি নিয়ে তাকায় চারিদিকে।

কিন্তু কোথায় তৈমুর চাচা, আর কোথাই বা সালেহা।

অনেক খোঁজা খুঁজি করেও যখন সালেহাকে আর খুঁজে পেলেন না, তৈমুর চাচা তখন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন—হায় খোদা একি হলো! একি হলো!

সালেহা তৈমুর চাচার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে পড়ে অনেক দূরে। পুটলিটা এখনও তার বগলে চাপা রয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে চারিদিকে তৈমুর চাচার সন্ধান করছে সে।

এমন সময় একজন দুষ্ট লোক এসে সালেহাকে জিজ্ঞাসা করে—কি হয়েছে খুকী? কাঁদছো কেনো?

সালেহা কাঁদতে কাঁদতে বলে—চাচাজানকে খুঁজে পাচ্ছি না।

দুষ্টলোকটা দরদ ভরা গলায় বলে উঠে—তোমার চাচাজানকে খুঁজে পাচ্ছোনা? আহা এই শহরে কোথায় তাকে খুঁজবে। তা কোথায় যাবে তুমি?

তাতো জানিনা। বলে সালেহা।

দ্বিতীয় দুষ্ট লোকটি এগিয়ে আসে—চলো আমাদের বাসায়। তারপর তোমার চাচাকে খোঁজা যাবে।

প্রথম দুষ্ট লোক—সেই ভাল হবে। যাবে আমাদের সঙ্গে?

নিরুপায় সালেহা কি করবে, কোথায় যাবে ভেবে পায়না। বয়সও তার বেশী নয়। বুদ্ধি হয়নি তেমন কিছু। লোকগুলির দরদ মাখা কথায় বিশ্বাস করে মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানায়।

দুষ্ট লোক দুটি এবার সালেহাকে নিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়ে।

শহরের পথ বেয়ে গাড়ী ছুটে চলে।

জন মুখর রাজ পথ।

অসহায়া সালেহা গাড়ীর এক কোনে চুপ করে বসে তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে। কোনদিন সালেহা মোটরে উঠে নাই। গাড়ীতে বসে অবাক হয়ে দেখে সব। ক্ষণিকের জন্য ভুলে যায় সে তৈমুর চাচার কথা।

প্রথম দুষ্ট লোকটি বলে—তোমার নাম কি খুকী?

সালেহার সম্বিৎ ফিরে আসে, লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—আমার নাম সালেহা।

বাঃ চমৎকার নাম।

দুষ্ট লোক দুটি মুখ চাওয়া চাওয়ী করে নেয়।

দ্বিতীয় জন জিজ্ঞাসা করে—এ পুটলিতে তোমার কি আছে?

সালেহা সযত্নে পুটলির দিকে তাকিয়ে বলে—এতে আমার জামা কাপড় আছে—আর আছে আমার বই।

প্রথম দুষ্ট লোক হেসে বলে—বই! তুমি পড়া শোনা করো?

হাঁ আমি পড়ি। আমার পড়ার খুব ইচ্ছা আছে। বলে—সালেহা।

বেশ বেশ খুব ভাল কথা। দুষ্ট লোকগুলি সালেহা কে খুব করে সান্ত্বনা দেয়।

একটা বাড়ীর সম্মুখে এসে গাড়ী থেকে নেমে পড়ে দুষ্ট লোক দু'টি। সালেহাকেও নামিয়ে নেয় তারা।

বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যায় ওরা সালেহাকে।

একটি মহিলা এগিয়ে আসে। মুচ্‌কি হেসে বলে—এ আবার নতুন শিকার নাকি?

প্রথম দুষ্ট লোকটি চোখের ইশারায় তাকে কি যে বলে। তারপর সালেহাকে লক্ষ্য করে বলে যে—এই যে তুমি গাড়ীতে আসবার সময় বলছিলে পড়া শোনা করতে চাও; ইনি মাস্টার-নি তোমাকে ভাল করে লেখা পড়া শেখাবেন।

আবার চোখের ইঙ্গিতে কিছু কথা হয় তাদের মধ্যে।

দ্বিতীয় দুষ্ট লোকটি বলে—তুমি এখানে থাকো। আমরা তোমার চাচাকে খুঁজে আসি।

মহিলাটি সালেহাকে লক্ষ্য করে বলে—এসো, ভিতরে এসো।

মহিলা, সালেহাকে নিয়ে ভিতরে চলে যায়।

প্রথম দুষ্ট লোকটি দ্বিতীয় লোকটিকে বলে উঠে—তা'হলে যা পাওয়া যাবে তার ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি বুঝলে?

বুঝেছি ভায়া, বুঝেছি।

প্রথম দুষ্ট লোক দ্বিতীয় দুষ্ট লোকটির সঙ্গে হাতে হাত মিলালো। তারপর বেরিয়ে গেলো তারা।

মহিলাটি ভাল কোন মেয়ে নয়, সে একজন বাঈজী। আর ঐ দুষ্ট লোকগুলি তার সঙ্গী, সাথী। এদের দিয়ে বাঈজী তার ইচ্ছা মত কাজ করিয়ে নেয়। এ জন্য দুষ্ট লোকগুলি বাঈজীর নিকট হতে মোটা বখশীস্ লাভ করে।

বাঈজী সালেহাকে নিয়ে নিজের সুসজ্জিত কক্ষে গিয়ে বসে। মিষ্টি কথায় তাকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে।

সালেহার কিন্তু এ সব ভাল লাগছিলোনা মোটেই। তৈমুর চাচার জন্য মনটা অস্থির হয়ে উঠছিলো। একটা রুদ্ধ কান্না অতি কষ্টে বুকে চেপে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছিলো সে বাঈজীর মুখের দিকে।

গোটা দিন চলে গেলো। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। তবু চাচা এলোনা। লোক দুটি এক সময় এসে বলে—তোমর চাচাকে অনেক খুঁজেছি কিন্তু কোথাও পেলুমনা। আবার কাল খুঁজবো।

বাঈজী সালেহাকে অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে চারটি খাওয়ালো। তারপর বলে—ঘুমোও এখন। কাল তোমার চাচাজানকে পাবে।

সালেহা, নানা রকম চিন্তা করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে।

রাত বেড়ে আসে।

ঘুমোচ্ছে সালেহা।

পাশের ঘরে তখন নাচ গান চলেছে। নানা রকমের বাজনার তালে তালে নর্ত্তকীর নুপূরের শব্দ মিলে জায়গাটা মুখর হয়ে উঠেছে। সরাব পাত্রের টুন টান আওয়াজ আর মাতাল লোকদের জড়িত কণ্ঠস্বর গভীর রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিচ্ছিলো।

হঠাৎ সালেহার ঘুম ভেংগে যায়। বাজনা আর নুপূরের শব্দে সে চমকে উঠে ; ভাবে এ আবার কিসের শব্দ। ধীরে ধীরে উঠে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ায়। অতি লঘু পদক্ষেপে জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। উঁকি দেয় জানালার ফাঁকে।

পাশের ঘরের দৃশ্য দেখতে পেয়ে ভয়ে শিউরে উঠে। এ সব তো সে কোন দিন দেখে নাই। কেমন যেন ভয় হয় সালেহার। আস্তে সরে আসে সে জানালার পাশ থেকে।

ভয় বিহ্বল চোখে তাকায় চারিদিকে, এ জায়গাটা ভাল নয় বুঝতে পারে সালেহা। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় ওপাশের মুক্ত জানালা-টার পাশে। জানালাটা তেমন উচু নয়, সালেহা জানালা দিয়ে পার হয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে, তারপর ছুটতে থাকে সামনের দিকে।

প্রান পনে ছুটছে সালেহা। রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে, কোনদিকে তার খেয়াল নেই। যেমন করে হোক সালেহা ওদের হাত থেকে বাঁচতে চায়।

এদিক ওদিক তাকাচ্ছে আর ছুটছে সে।

নাচ-গান শেষ করে বাঈজী ঘরে ফিরে আসে।

কক্ষে প্রবেশ করেই চমকে উঠে সে, বিছানা শূন্য পড়ে আছে মেয়েটি নেই। ছুটে যায় বাঈজী পাশের ঘরে চীৎকার করে বলে —মেয়েটি পালিয়েছে।

এক সঙ্গে দুষ্ট লোক দুটি বলে উঠে—পালিয়েছে

অন্য একজন দুষ্ট লোক বলে—খাঁচার পাখী উড়ে গেছে।

বাঈজী কঠিন কণ্ঠে বলে উঠে—যেমন করে হোক মেয়েটাকে খুঁজে বের করো। তা'নাহলে টাকা যা নিয়েছো ফেরৎ দিতে হবে। যাও খুঁজে নিয়ে এসো।

প্রথম দুষ্ট লোক বলে—কোথায় আর যাবে নিশ্চয়ই ধারে ধুরে কোথাও লুকিয়ে আছে।

দ্বিতীয় লোকটি বলে—ধারে ধুরে কোথায় আর থাকবে। চল দেখি কোন দিক দিয়ে পালালো মেয়েটা ?

বাঈজীর সঙ্গে দুষ্ট লোক দু'টি বাঈজীর ঘরে এসে চারিদিকে দেখতে থাকে। একজনের নজর চলে যায় ওপাশের জানালায়। হঠাৎ তার নজরে পড়ে জানালার পাশে পড়ে রয়েছে সালেহার ওড়না খানা।

এবার দুষ্ট লোকটির চোখ দুটো উজ্জল হয়ে উঠে, আনন্দ ধ্বনি করে উঠে— পেয়েছি, পেয়েছি।

কোথায় পেয়েছিস ?

ঐ দেখ্……আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় প্রথম দুষ্ট লোকটা জানালার পাশে পড়ে থাকা সালেহার ওড়না খানা।

দ্বিতীয় দুষ্ট লোকটা বলে উঠে—ঐ দিক দিয়েই মেয়েটা ভেগেছে। শীগ্‌গীর চল.....

দুষ্ট লোক দু'টি সেই জানালা পথে পার হয়ে, বাইরে বেরিয়ে যায়। যাবার সময় বাঈজীকে লক্ষ্য করে বলে যায়—এক্ষুনি ছুরিকে পাকড়াও করে তোমার হাতে এনে দিচ্ছি।

পথ ধরে ছুটতে থাকে দুষ্ট লোক দু'টি। চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে আর ছুটছে।

ওদিকে সালেহাও প্রাণভয়ে ছুটে চলছে।

বাতাসে চুলগুলি তার উড়ছে। দু'চোখে ভয়াতুর দৃষ্টি। মুখ মণ্ডল বিবর্ণ ফ্যাকাশে। সমস্ত শরীর ঘেমে নেয়ে উঠেছে।

এমন সময় মওলা মিয়া মাতাল অবস্থায় গান গাইতে গাইতে সেই পথে এগুচ্ছিলো।

সালেহা তাকে দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে বলে উঠে —আমাকে বাঁচান। আমাকে বাঁচান।

মওলা মিয়ার দু'চোখে তখন মদের নেশা। সালেহাকে সে ঝাপসা দেখে। জড়িত কণ্ঠে বলে উঠে—হামসে নেই হোগা। দু'হাতে সরিয়ে দেয় সে সালেহাকে।

ততক্ষণে দুষ্টলোক দু'টি নিকটে এসে পড়েছে।

যদিও রাতের অন্ধকার চিনতে পারে না তারা সালেহাকে। ছুটে গিয়ে ধরে ফেলে ওরা ওকে।

সালেহা ভীতভাবে চীৎকার করে উঠে।

সম্বিৎ ফিরে আসে মওলা মিয়ার। চোখ রগরে ভাল করে তাকায় সে। দেখতে পায় মেয়েটাকে দু'টো লোক ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

টল্‌তে টল্‌তে মওলা মিয়া গিয়ে ধরে ফেলে ওদের দু'জনকে।

ধস্তাধস্তি শুরু হয়। লোক দু'টো মওলা মিয়াকে ঘুসি মেরে ফেলে দেয়। মাটিতে পড়ে যায় মওলা মিয়া। কিন্তু সে মার খেয়ে যাবার বান্দা নয়, আবার উঠে ঝাপটে ধরে লোক দু'টোকে।

পুনরায় শুরু হয় ধস্তাধস্তি।

এমন সময় পুলিশ এসে পড়ে সেখানে।

দুষ্টলোক দুটির মধ্যে একজন বলে—এ মেয়েটি আমাদের। ঐ ম্যাতালটা……আংগুল দিয়ে মাওলা মিয়াকে দেখিয়ে দেয় সে।

মওলামিয়া ভীষণ ভাবে রেগে উঠে—খবরদার। মিথ্যে কথা বলবে না। ও আমার বোন। এবার পুলিশকে লক্ষ্য করে বলে মওলামিয়া—দেখুন ওকে জোর করে ওরাই ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

সালেহাও মওলা মিয়ার কথায় যোগদিয়া বলে—হ্যাঁ ওরা ভাল লোক নয়। আমাকে ওরা জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

পুলিশ বলে উঠে—বুঝেছি। বদমাইশ, এবার চল্ বেটারা থানায় চল্।

দ্বিতীয় পুলিশ বলে—তাইতো এতো ছেলেমেয়ে চুরির হিড়িক পড়ে গেছে। এসব এই বেটাদের কাজ।

পুলিশ দুষ্টলোক দুটিকে বেঁধে থানায় নিয়ে যায়।

ওরা চলে যেতেই সালেহা মওলা মিয়ার দিকে তাকালো।

মওলা মিয়াও তাকিয়ে আছে সালেহার দিকে।

মওলা মিয়া ওকে হাত দিয়ে ডাকে।

সালেহা যেন অকুলে কুল পায়, ছুটে গিয়ে মওলা মিয়াকে জড়িয়ে ধরে—ভাইয়া।

মওলা মিয়া গভীর স্নেহে সালেহাকে টেনে নেয় বুকের মধ্যে। আদর করে বলে—বোন্ তোমার নাম কি? তুমি থাকো কোথায়? তোমার আব্বার নাম কি?

সালেহা এতোক্ষণে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে এসেছে, বলে সে —আমার নাম সালেহা। আমার আব্বা, আম্মা কেউ নেই। এক মাত্র নানী ছিলো সেও মারা গেছে।

তবে কি করে এখানে এলে?

আমার এক চাচার সঙ্গে শহরে এসে ছিলাম। চাচাকে আর আমি খুঁজে পাচ্ছিনা।

তবে তো মুস্কিলের কথা। মওলা মিয়া চিন্তিতভাবে কথাটা উচ্চারণ করে। একটু ভেবে বলে—আচ্ছা, এখন তা'হলে চলো আমাদের বাড়ী।

সালেহা বলে—চলো ভাইয়া।

মাওলা মিয়া সালেহাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর পথে পা বাড়ায়।

মওলা মিয়া শহরের একটি হোটেলে কাজ করে। পয়সা যা পায় মদ খেয়েই উড়িয়ে দেয়। মদ খাওয়া অবশ্য তার সখের নেশা নয়। মদ খাওয়ার পিছনে রয়েছে একটি ব্যথার কাহিনী।

মওলা মিয়া যখন যুবক ছিলো তখন সে ভালবেসে একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিলো। প্রান দিয়ে ভালবেসে ছিলো সে বৌকে। কিন্তু বৌ একদিন মওলার ভালবাসাকে উপেক্ষা করে চলে গেলো অন্য একটি পুরুষের সঙ্গে।

প্রচণ্ড আঘাত পেলো মওলা মিয়া প্রানে। দারুন ব্যথা ভুলবার জন্য শেষে মদ ধরলো সে। মদ খেয়ে ভুলতে চাইলো মওলা মিয়া বৌকে। সেই থেকে ও মদ খায়।

আসলে মাওলা মিয়া মাতাল হলেও চরিত্রহীন বা লম্পট নয়। হোটেলে কাজ করলেও মওলার হৃদয় ছিলো মহৎ উদার। সে সালেহাকে নিজের বোনের মত মনে করেই নিজ বাড়ীতে নিয়ে চলে।

মওলা মিয়ার পাশের বাড়ীতেই ছিলো এক বুড়ি মা, মওলা মিয়াকে খুব ভাল বাসতো সে।

মওলা মিয়া সালেহাকে এনে বুড়ি মার হাতে তুলে দিলো—বুড়ি মা এ বড় অসহায়া মেয়ে, তুমি একে দেখো।

বুড়ি মা তো খুব খুশী, সালেহাকে আদর করে টেনে নিলেন বুকে!

তৈমুর চাচা সালেহাকে হারিয়ে বিষণ্ন মনে বাড়ী ফিরে গেলেন। দু'দিন শহরে থেকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছেন তিনি তবু সালেহার

সন্ধান পাননি। শেষ পর্যন্ত নিরাশ হৃদয়ে বাড়ী ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন তৈমুর চাচা।

এসে অবধি দিন রাত সালেহার চিন্তায় মন মরা হয়ে বসে থাকেন। কখনও কখনও নির্জনে বসে চোখের পানি ফেলেন। স্ত্রীর জন্য কোন দুঃখ প্রকাশ করতে পারেন না।

এমনিতেই সব সময় স্ত্রীর কাছে তাঁকে গাল মন্দ খেতে হচ্ছে। যখনই নিরালায় বসে একটু ভাবে সালেহার কথা, হায় মেয়েটা গেলো কোথায়? না জানি কেমন আছে সে, কোথায় আছে। কি খাচ্ছে, কিংবা না খেয়ে আছে এ সব ভাবতে ভাবতে চোখ দু'টো তাঁর অশ্রু ছলছল করে উঠে।

অমনি হয়তো চাচী এসে দাঁড়ায় তাঁর সম্মুখে—এখানে অমন চুপটি মেরে বসে আছো কেনো? মেয়ের কথা বুঝি স্মরণ হয়েছে! আহা দরদ দেখে বাঁচিনে। কত আর ঢং দেখবো। বলি উঠবে, না এমনি করে বসে থাকবে?

চলো! একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে উঠে পড়েন তৈমুর চাচা।

হয়তো খেতে বসে খাওয়া ভুলে ভাবে তৈমুর চাচা, না জানি সালেহা-এখন না খেয়ে কোথায় পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তৈমুর চাচার চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে ভাতের থালায়।

অমনি খেঁকিয়ে উঠে চাচী—কি হলো। আবার মনে পড়েছে বুঝি? দেখো ভাতের থালায় বসে অমন চোখের পানি ফেললে অমঙ্গল হবে। একটি ছেলে আমার কোন কিছু হলে দেখে নেবো।

এমনি নানা রকম কথা রোজ শুনতে হয় তৈমুর চাচাকে। তবু তিনি সালেহার চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন না।

সেদিন তৈমুর চাচার স্ত্রী উঠানে বসে ছোট মাছ কুটছিলো। এমন সময় তৈমুর চাচা আনন্দ ভরা কণ্ঠে স্ত্রীকে ডাকতে ডাকতে উঠানে প্রবেশ করলো—ওগো শুনছো, শুনছো……হাতে তাঁর এক খানা পোষ্টকার্ড। খুসীতে আত্মহারা হয়ে স্ত্রীর পাশে এসে দাঁড়ায়—সালেহা বেঁচে আছে। নাসেরের মা, সালেহা বেঁচে আছে।

খেঁকিয়ে উঠে নাসেরের মা—বেঁচে থাকবে নাতো কি মরবে। অপয়ার কোন দিন মরন আছে।

কি সব বক্ বক্ করছো, শোনই-না কি লিখেছে ? চিঠিখানা পড়তে শুরু করেন তৈমুর চাচা—

"চাচাজান, আমার ছালাম জানবেন। আমি ভাল আছি। আপনাকে না পেয়ে আমি সেদিন খুব কেঁদেছিলাম। আমি মওলা মিয়া নামে একটি লোকের কাছে আছি। সে খুব ভাল মানুষ। আমি তাকে ভাইয়া বলে ডাকি। সে আমাকে খুব স্নেহ করে। আমি স্কুলে ভর্তি হবো। চাচী মাকে আমার ছালাম জানাবেন। কোন চিন্তা করবেন না।"

ইতি—

সালেহা

পোষ্টকার্ডের আঁকা বাঁকা অক্ষরগুলি বার বার পড়তে লাগলেন তৈমুর চাচা। সালেহা নিজের হাতে চিঠি লিখেছে এ কম কথা নয়। তাঁর ঠিকানাটাও মনে রেখেছিলো ভেবে খুসী হন তিনি। নইলে আজ এ চিঠিও পেতেন না। সত্যি মেয়েটার বুদ্ধি আছে।

তৈমুর চাচার চোখে মুখে আনন্দ ঝরে পড়ে।

চাচী স্বামীকে লক্ষ্যকরে বলে উঠে—তাও ভাল, যে একটা মানুষের হাতে পড়েছে। খারাপ লোকের হাতে পড়লে যেতো গোল্লায়।

হাঁ আল্লাহ ওর ইচ্ছা পূর্ণ করুন। মা আমার ভাল লোকের হাতেই পড়েছে। যাই মওলা মিয়াকে একটা চিঠি দেই। এই তো পোষ্টকার্ডের উপরে মাওলা মিয়ার ঠিকানা লিখা রয়েছে।

স্বামীর কথায় রাগে গস্ গস্ করে চাচী।

তৈমুর চাচা চিঠি হস্তে চলে যান।

চাচী স্বামীর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত পেষেণ। মনে হয় তার দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। রাগে ক্ষোভে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে চাচী। ভাবে একটা অপয়া মেয়ের জন্য

তাঁর এত মাথা ব্যথা কেনো। গেছে ঝঞ্ঝাট বিদেয় হয়েছে। আপোদ গেছে.....

"কথাই বলে—হিংসুক পুড়িয়া মরে হিংসার আগুনে,
কোথা পাবে শান্তি-সুখ জ্বলন্ত জীবনে।"

তৈমুর চাচার স্ত্রীর সেই অবস্থা। নিজের সুখ সুবিধা নিয়েই সে সব সময় মেতে থাকে, পরের ভাল তার চক্ষুশূল।

সালেহা বুড়িমাকে পেয়ে খুব খুসী হয়েছে। মায়ের স্নেহ, বোনের আদর সব পায় সে তার কাছে।

মাওলা মিয়া যখন হোটেলের কাজে চলে যায়, সালেহা তখন বুড়িমার সঙ্গেই কাটায়। বুড়িমা ওর সঙ্গে গল্প করে, চুল বেঁধে দেয়। সালেহা বই পড়ে, বুড়িমা বসে বসে শোনে, হাসে কত কথা বলে।

সেদিন বুড়িমা সালেহার চুল আঁচড়ে দিচ্ছিলো আর গল্প করছিলো—দেখ সালেহা, মওলা যেমন তোর ভাই, আমিও ঠিক তোর তেমনি বুড়িমা। কিন্তু আমাকে তুই সই বলে ডাকবি কেমন ?

সালেহা মাথা কাৎ করে বলে—আচ্ছা।

বুড়িমা হেসে বলে—ইসকুলে লেখা-পড়া করতে তোর ভাল লাগছে ?

হাঁ, খুব ভাল লাগছে।

দেখ্ সই আমার একটা কথা রাখবি ?

কি কথা বলো ?

রোজ আসবি আমার কাছে চুল বাঁধতে ?

ঠিক আসবো। সত্যি বুড়িমা তুমি.....

আবার বুড়িমা, বল্ সই।

সত্যি সই তোমার চুল বাধা খুব সুন্দর।

বুড়িমা সালেহার চিবুক ধরে নাড়া দিয়ে বলে—এই বুড়ো সই এর হাতে চুল বাঁধা খুব বুঝি পছন্দ ?

সালেহা এক নানী ছাড়া কারো কাছে কোনদিন এতোটুকু আদর-যত্ন পায়নি। এখন এই বুড়িমার কাছে প্রাণঢালা স্নেহ আর ভালবাসা পেয়ে কিযে আনন্দ পায় সেই জানে।

উৎফুল্ল নয়নে তাকিয়ে থাকে বুড়িমার মুখের দিকে।

এমন সময় মওলা মিয়ার কণ্ঠস্বর সোনা যায়, ডাকে সে—সালেহা।

বুড়িমা বলে উঠে—সালেহা যা, মওলা বুঝি হোটেলে যাবে।

দড়বড় উঠে পড়ে বলে সালেহা—যাই ভাইয়া।

আয়না চিরুনী হাতে মওলা মিয়ার সম্মুখে এসে দাঁড়ায় সালেহা—আমায় ডাকছো ভাইয়া ?

হাঁ আমি কাজে যাচ্ছি। তোর যে দু'খানা বই বাকী আছে কাল লিখে এনে দিস্, এনে দেবো।

আচ্ছা ভাইয়া।

কিছু বলবি ?

না।

মাওলা মিয়া কাজে চলে যায়।

সালেহা তাকিয়ে থাকে তার মওলা ভাইয়ের চলে যাওয়া পথের দিকে।

পরদিন মওলা মিয়া কাজে যাবে এমন সময় কে যেন দরজার কড়া নাড়লো। মওলা মিয়া গোসল সেরে গামছায় মাথা মুছতে মুছতে বলে—কে ?

চিঠি আছে, জবাব আসে।

মওলা মিয়া ভাবে—চিঠি, চিঠি আবার এলো কোথা থেকে। এ দুনিয়ায় তাকে চিঠি দেবার মত কেউ তো নেই। এগিয়ে যায় সে দরজার দিকে।

পিয়ন একখানা চিঠি মাওলা মিয়ার হাতে দিয়ে চলে যায়।

মওলা মিয়া চিঠি হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে। লেখাপড়া সে বিশেষ জানে না। চিঠি হাতে দাওরায় গিয়ে বসে এমন সময় সালেহা বই হাতে উঠানে প্রবেশ করে।

মওলা মিয়া সালেহাকে দেখতে পেয়ে হেসে বলে—এতো সকাল সকাল চলে এলে ?

ছুটি হয়ে গেলো ভাইয়া।

মওলা হেসে বলে—চিঠি ! দেখোতো কে লিখিছে ?

সালেহা উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠে—চিঠি ! হাতে নিলো সে।

মওলা মিয়া বলে—পড়ো ?

ততক্ষণে বুড়িমাও এসে দাঁড়িয়েছে মওলা মিয়া আর সালেহার পাশে। সালেহা বইগুলি পাশের তাকে রেখে এসে চিঠিখানা পড়তে শুরু করে—

"ভাই মওলামিয়া, আমার ছালাম নিবেন। যদিও আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, তবু সালেহার চিঠিতে আপনার সম্বন্ধে সব অবগত হয়েছি। সালেহার এ দুনিয়ায় কেউ নেই। ওকে আশ্রয় দিয়ে আপনি যে মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছেন তার সীমা নেই। ওকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন শুনে অনেক খুসী হয়েছি। সালেহার ইচ্ছা সে ডাক্তার হবে। আপনাকে বেশী করে কিছু বলতে হবে না। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন।" ইতি—

তৈমুর তালুকদার।

সালেহা ধীরে ধীরে চিঠিখানা পড়া শেষ করে আনন্দ ভরা কণ্ঠে বলে-উঠে—ভাইয়া, এ চিঠি আমার চাচাজান লিখেছেন।

মওলা মিয়া খুব খুসী হয়েছে। সালেহার হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে দেখে সে। তারপর বলে—আমি আগেই বুঝতে পেরেছি এ চিঠি তোমার বাড়ী থেকে এসেছে। যাক্ ভালই হলো এখন থেকে আমি নিশ্চিন্ত।

বুড়িমা এতোক্ষণ নিশ্চুপ শুনছিলো সব, হেসে বলে—মওলা তুই বোন পেয়েছিস্ আর আমি পেয়েছি সই, খুব ভাল তাই নারে ?

এক সঙ্গে হাসে তিন জনা।

মওলা বলে—যাই, এবার কাজে যেতে হবে।

মওলা মিয়া খাবার ঘরের দিকে চলে যায়।

বুড়িমা সালেহাকে লক্ষ্য করে বলে—চল্ সই চুল বেঁধে দিই। চলো সই।

বুড়িমার সঙ্গে সালেহা এগিয়ে যায়।

চুল বাঁধতে বাঁধতে কত কি কথা হয় বুড়িমা আর সালেহার মধ্যে।

এমনি করে দিনের পর দিন কেটে চলে।

মওলা মিয়া নানা রকম দুঃখ কষ্ট আর হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খেটে সালেহার লেখা-পড়া শিখার পয়সা জোগাড় করে। স্কুলের ফি, বই খাতা, পেন্সিল কিনার দাম সংগ্রহ করতে মওলা মিয়া হাঁপিয়ে পড়ে। পরিশ্রম তার বেড়ে যায় অত্যন্ত। তবু নীরবে সে সালেহার পড়ার খরচ জুগিয়ে চলে।

এমনি করে কেটে যায় দশটি বছর।

সালেহা এখন আর পূর্বের মত ছোট মেয়েটি নেই। এখন সে অনেক বড় হয়েছে। এখন সে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী।

আজ সালেহার সাধনা সার্থক হতে চলেছে। নানীর মৃত্যুকালে শপথ করেছিলো সে ডাক্তার হবে। সালেহা আজ ডাক্তার হতে চলছে। তার জীবনের আশা বাসনা পূর্ণ হতে চলছে।

কিন্তু এই সাধনার পিছনে রয়েছে অপরিসীম ধৈর্য আর প্রাণপণ সংগ্রাম। শুধু তার নিজের জীবন সংগ্রামেই সালেহা জয়ী হতে চলে নাই, এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে মওলা মিয়ার হৃদয় নিংড়ানো স্নেহ আর ভালবাসা।

মওলা মিয়ার শরীরের প্রতিটি রক্ত বিন্দু দিয়ে সালেহার সাফল্যের সোপান তৈরী করে দিয়েছে। যদিও সালেহা তার কেউ নয় তবু মওলা মিয়া কোনদিন ভাবতে পারেনি সালেহা তার পর।

বুড়িমার অসীম স্নেহও সালেহার জীবনে এক বড় সম্পদ।

মওলা মিয়া যখন সালেহাকে বুড়িমার কাছে রেখে হোটেলের কাজে চলে যেতো, তখন সালেহা তার কাছেই পেতো একমাত্র আশ্রয়। সেই তাকে আঁচলের নীচে আগলে রাখতো মায়ের মত করে। লেখা-পড়া করবার সময় বসে থাকতো পাশে। চুল বেঁধে দিতো, কাপড় পরিয়ে দিত। এমন কি ঘুমাবার সময় বুড়িমা ওকে নিজের কোলের মধ্যে নিয়ে ঘুমাতো।

সর্বহারা সালেহা মওলা মিয়া আর বুড়িমার স্নেহ আদরে আজ এতো বড় হতে পেরেছে।

সেদিন বুড়িমা সালেহার চুল বেঁধে দিচ্ছিলো আর গল্প করছিলো। বলছিলো বুড়িমা—আচ্ছা সই, তুই তো ডাক্তারী পড়িস্। ঐ যে শুনি তোরা নাকি মরা মানুষ কাটা-কাটি করিস্ এ কথা সত্যি ?

হাঁ সত্যি। কেনো বলো তো ?

তোদের ভয় লাগে না ?

প্রথম প্রথম ভয় লাগতো, এখন আর লাগে না। গা সওয়া হয়ে গেছে। এখন কত জ্যান্ত মানুষ কাটা-কুটা করবো।

সত্যি !

একেবারে সত্যি। একদিন দেখবে তোমাকে না কেটে বসি।

সালেহার কথায় বুড়িমা চোখ দুটি বড় করে তাকায়—ওমা সেই জন্যে আমি বুঝি তোর এতোদিন চুল বেঁধে দিলুম।

ভয় নেই বুড়িমা তোমাকে কাটবো না।

হেসে বলে বুড়িমা—আমি জানিরে জানি। তুই কি আমাকে কষ্ট দিতে পারিস্। দেখ সই, তোকে লেখা-পড়া শিখাতে মওলা-বাবাজীর অনেক কষ্ট করতে হয়েছে দেখিস্ বোন কোন দিন যেন ওকে ব্যথা দিস্নে।

সালেহা ভাবাপন্ন কণ্ঠে বলে উঠে—সত্যি সই, মওলা ভাইয়া আমার জন্য অনেক করেছে। জীবনে তার ঋণ শোধ করেত পারবো না।

তা-ছাড়া তোমার সাহায্য না পেলেও আমি বাঁচতে পারতুম না। তোমাকেও আমি ভুলবোনা কোন দিন।

বুড়িমা আর সালেহা কথাবার্তা বলছিলো, এমন সময় মওলা-মিয়া উপস্থিত হয়। সালেহাকে লক্ষ্য করে বলে—এই যে সালেহা তোর মাইনে দিতে হবে যে বলেছিলি ?

উঠে দাঁড়ায় সালেহা, বলে—হাঁ ভাইয়া কালকে।

আচ্ছা আমি কাল এনে দেবো। চললুম।

দাঁড়াও ভাইয়া।

সালেহা ভিতরে চলে যায় তারপর মওলা মিয়ার জামা এনে হাতে দেয়।

মওলামিয়া নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে হাসে। তাইতো শুধু গেঞ্জি গায়েই বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। হেসে সালেহার হাত থেকে জামাটা নিয়ে পরতে পরতে বলে—ঐ দেখো জামা না পরেই চলে যাচ্ছিলুম। বয়স বেড়েছে তো, কেমন যেন তালকানা বনে যাচ্ছি। তুই না থাকলে আমার যে কি হতো।

ভাইয়া তুমি না থাকলে আমারও যে কি হতো।

বুড়িমা ওদের দু'জনার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসে।

সালেহা তার মেডিক্যাল কলেজের সহপাঠি সেলিমের কাছেও কৃতজ্ঞ। সেলিম নিজের বই দিয়ে সালেহাকে পড়া শোনায় অনেক সাহায্য করেছে। সেলিমের এই দান সালেহার কাছে অনেক বড়। তার সহায়তা না পেলে সালেহার হয়তো ডাক্তারী পড়া সম্ভব হয়ে উঠতোনা।

প্রায়ই তাই সালেহাকে আসতে হতো সেলিমের বাড়ীতে।

সেলিমের মাকে খালা আম্মা বলে ডাকতো সালেহা। সেলিমের আম্মাও সালেহাকে খুব ভাল বাসতেন। রূপে গুনে এমনি একটি মেয়েকে তিনি ভাবতেন ছেলের পাশে।

কিন্তু মুখ ফুটে কোনদিন তিনি কিছু বলতেননা কারো কাছে।

সেলিমও যে সালেহাকে ভালবাসতোনা তা নয়। সে সালেহাকে নিজের অজ্ঞাতেই কখন যে হৃদয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করে বসেছে সে নিজেই জানেনা।

সালেহার ভাসা ভাসা ডাগর চোখ দু'টি সেলিমের গোটা অন্তরে রেখাপাত করেছলো। সালেহার সান্নিদ্ধ তার হৃদয়ে এক অনাবিল আনন্দ বয়ে আনতো। এক কথায় সেলিম ভালবেসে ফেলেছিলো সালেহাকে।

সালেহার মনেও যে সেলিম দাগ কাটেনি তা নয়। কিন্তু সালেহা ছিলো অত্যন্ত ধৈর্যশীলা। নিজকে সে সব সময়ের জন্য সংযত করে রাখতো। তার হাবভাবে কোন দিন সেলিম তার মনের কথা খুঁজে পেতোনা।

সালেহা ছিলো অতি নম্র স্বভাবের মেয়ে। অতি স্বাভাবিক পোষাক পরিচ্ছদ পরতে সে ভাল বাসতো। স্বাভাবিক বেশেই তাকে মানাতো। খুব সুন্দর লাগতো ওকে। সেলিম ওকে পড়া বুঝিয়ে দিতে গিয়ে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকতো ওর মুখে। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেতো দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে নিজেকে সংযত করে নিতো সে।

সেদিন সেলিম নিজের বাড়ীর ড্রইং রুমে বসে একটা ম্যাগাজিন দেখছিলো, এমন সময় দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হয়। সেলিম উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েই বলে উঠে—আরে আপনি!

দু'খানা মোটা বই হাতে কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে সালেহা। বলে সে—হাঁ আমি।

হেসে বলে সেলিম—আসুন, ভিতরে আসুন।

সালেহা কক্ষে প্রবেশ করে। সেলিম তাকে লক্ষ্য করে বলে—বসুন। তারপর উচ্চ কণ্ঠে ডাকে—মা, দেখে যাও কে এসেছে।

পাশের কক্ষ থেকে ভেসে আসে সেলিমের মায়ের কণ্ঠস্বর—কে এসেছে সেলিম?

দেখে যাও।

মা কক্ষে প্রবেশ করে আনন্দ ভরা কণ্ঠে বলে উঠেন—ও সালেহা। বসো মা, বসো। আমি তোমাদের জন্য চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

হাতের বইগুলি পাশের টেবিলে রেখে বলে উঠে সালেহা—থাক খালা আম্মা। আজ আমি চা বানিয়ে আপনাদেরকে খাওয়াবো।

হেসে বলেন মা—বেশতো। এসো মা।

সালেহা একবার সেলিমের মুখের দিকে তাকিয়ে মায়ের সঙ্গে রান্না ঘরের দিকে চলে যায়।

মা আর সালেহা চলে যেতেই, সেলিম নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে। ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে ভাবে সে··· সালেহাকে তার বড় ভাল লাগে, ওকে আপন করে পাবার জন্য মনটা আকুল হয়ে উঠেছে। মাকে কথাটা বলবে কিনা চিন্তা করতে লাগলো সেলিম।

সেলিমের পিতা নেই, একমাত্র মাই তার সব। তার মনের কথা মাকে না বলে তো কোন উপায় নেই। না বললে তিনিই বা বুঝবেন কি করে। সালেহাকে ছাড়া তার চলবে না। সমস্ত মন জুড়ে বসে আছে সালেহা·····

সেলিমের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায়।

সালেহা একটা ট্রেতে দু'কাপ চা নিয়ে হাজির হয়, মৃদু হেসে বলে সে—সেলিম সাহেব আপনার চা।

চোখ তুলে তাকায় সেলিম, অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেসা করে—আপনি কেনো এসব করতে গেলেন ?

হেসে বলে সালেহা—কেনো এতে কি হলো ? ট্রেটা টেবিলে রেখে চায়ের কাপ দু'টো সাজিয়ে রাখে সে সেলিমের সম্মুখে।

সেলিম এক কাপ চা হাতে উঠিয়ে নিয়ে কাপে চুমুক দিয়ে বলে—বসুন। নিন আপনার চা·····

সালেহা বসে নিজের কাপটা হাতে উঠিয়ে নেয়।

সেলিম বলে—দেখুন আপনি এলে মা খুব খুসী হন।

আপনি কিন্তু ঠিক তার উল্টো……

না না আমিও।

সত্যি ?

দু'জনার দিকে তাকিয়ে হাসে দু'জনা।

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিলো। সালেহা ট্রের উপরে চায়ের কাপ দুটো তুলে নিয়ে উঠতে যায়।

সেলিম বাধা দিয়ে বলে উঠে—আপনি বসুন। তারপর উচ্চ কণ্ঠে—বয়। বয়…

গামছা কাধে রহিম কক্ষে প্রবেশ করে।

সেলিম সম্মুখস্থ চায়ের কাপগুলি দেখিয়ে দিয়ে বলে—নিয়ে যা।

বয় চায়ের কাপ সহ ট্রে হাতে বেরিয়ে যায়। বয় বেরিয়ে যাবার সময় বলে দেয় সালেহা—আমার জন্য একটা রিস্কা এনো।

যেতে যেতে বলে রহিম—আচ্ছা।

এক্ষুণি যাবেন ? বলে সেলিম।

হাঁ, যেতে হবে।

একটু পরে রহিম কক্ষে প্রবেশ করে বলে—রিস্কা এসে গেছে।

রহিম কথাটা বলে বেরিয়ে যায়।

সালেহা বই হাতে উঠে দাঁড়ায়—চলি তা'হলে ?

সেলিম হেসে বলে—আপনি কিন্তু একদিনও আপনার বাড়ীতে নিয়ে গেলেন না।

সালেহার মুখ মণ্ডল করুন হয়ে উঠে। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে সালেহা—যেখানে থাকি সেখানে আপনাদের মত লোককে নিয়ে যেতে সাহস হয় না। আচ্ছা তা'হলে বইগুলো পরশু দিন কলেজে আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি ? চলি।

এমন সময় সেলিমের মা বক্ষে প্রবেশ করেন—যাচ্ছো মা ?

হাঁ খালা আম্মা।

এসো মা।

সালেহা বইগুলি নিয়ে বেরিয়ে যায়।

সেলিম নত মুখে ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে চলে। মুখ মণ্ডল তার প্রসন্ন।

হেসে বলেন মা—মেয়েটিকে আমার বড় ভাল লাগে।

সেলিম মায়ের মুখে বাঁকা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে—তাই নাকি ?

হাঁ, মনে হয় যেন আপন জন।

ওকে তোমার পছন্দ হয় ?

ওর মত একটা বৌ যদি আনতে পারতুম।

ওর মত ? ওকে নয় ?

নিশ্চয়ই ওকে।

হাসে সেলিম। যে কথা আজ তারই বলবার কথা, সে কথা মায়ের মুখ দিয়েই বের হয়েছে। মনে মনে খুসী হয় সেলিম। আনন্দের আতিশয্যে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে সেলিম—সত্যি বলছো মা ?

হাঁ বাবা। ওমনি একটি মেয়েকে যদি আমি পাশে পেতুম···

খুব খুসী হতে বুঝি ?

খুব।

সেলিম আর মা যখন সালেহাকে নিয়ে আলোচনা চলে ঠিক সেই মুহূর্তে সালেহা রিস্কায় চেপে এগিয়ে চলেছে।

তমিজউদ্দিন সাহেবের ছেলে সাজ্জাদ আজ উচ্চডিগ্রি লাভ করে দেশে ফিরে এসেছে। সাজ্জাদের সুন্দর চেহারা আজ আরও সুন্দর হয়েছে। তেমনি সুন্দর হয়েছে তার মন। এতো দিন বিদেশে কটিয়েও তার স্বভাব চরিত্রে কোন রকম ত্রুটী দেখা দেয় নাই।

A-3886/70

তমিজউদ্দিন সাহেব আজ আনন্দে আত্মহারা। একমাত্র পুত্রের সাফল্য তার মনে এনেদিয়েছে এক অনাবিল আনন্দ উৎস।

সবচেয়ে মান্নান খুসী হয়েছে বেশী।

সাজ্জাদকে সে কোলে কাঁখে করে মানুষ করেছে। কাজেই সাজ্জাদের উপর তার দাবীটাই বেশী।

বিলেত থেকে সাজ্জাদ ফিরে আসবার পর মান্নান ধরে বসলো আমার জন্য কি এনেছো ছোট সাহেব ?

সাজ্জাদ মান্নানের জন্য ভাল কয়েকটা জামা কাপড় এনেছিলো লুকিয়ে রেখে বলে—তোমার জন্য একটা লাল টুক টুকে মেম সাহেবের অর্ডার দিয়ে এসেছি। বাস্ এলো বলে।

মান্নান এখন আর আগের সেই যুবকটি নেই তবু তার মনটি কিন্তু বেশ সবুজ রয়েছে। হেসে বলে—লাল টুক টুকে মেম সাহেব কি অর্ডার দিয়ে পাওয়া যায় ছোট সাহেব। ধরে আনতে হয়।

সাজ্জাদ বলে—মান্নান ভাই আব্বা কোথায় ?

বাইরের ঘরে।

আমি একটু বাইরে যাবো।

এই তো সকালে এসেছো একটা দিন বিশ্রাম করো তার পর বের হবে।

আমি কি পায় হেটে এসেছি, যে বিশ্রাম করতে হবে। কোট-টা গায়ে পরতে পরতে বলে সাজ্জাদ।

মান্নান বলে—তাহলে চা নাস্তা খেয়ে যাও।

শুধু খাওয়া আর খাওয়া। এসে অবধি কত বার চা নাস্তা খেলুম বলোতো ? এখন বন্ধুর বাড়ী যাচ্ছি-সেখানেও খাবো। তারপর নিজ মনেই বলে চলে সাজ্জাদ—কতদিন পর সেলিমের ওখানে যাচ্ছি।

ছোট সাহেব গাড়ী বেরকরতে বলবো ?

না থাক্ একটা স্কুটার ডেকে দাও। দেখো আব্বা যেন জানতে না পারেন।

মান্নান বেরিয়ে যায়।

সাজ্জাদ বাইরে বেরুতে যাবে এমন সময় তমিজউদ্দিন সাহেব হলঘর থেকে তাকে দেখে ফেলে, একটা বই তিনি পড়ছিলেন, বন্ধ করে রেখে বলে উঠেন—সাজ্জাদ কোথায় যাচ্ছো ?

থমকে দাঁড়ায় সাজ্জাদ, এগিয়ে এসে পিতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলে—সেলিমের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

এসে অবধি বিশ্রাম নেই। সকাল সকাল ফিরো।

আচ্ছা আব্বা।

স্কুটারে যেন যেও না। গাড়ী নিয়ে যাও।

সাজ্জাদ ততক্ষনে বেরিয়ে গেছে।

গাড়ী বারেন্দায় দাঁড়াতেই ড্রাইভার বলে উঠে—গাড়ী বেরকরবো ছোট সাহেব ?

দরকার নেই। আব্বাকে বোল না।

ওপাশে স্কুটার নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো মান্নান।

সাজ্জাদ স্কুটারে চেপে বসে।

অনেক দিন পর আজ স্কুটারে চাপলো সাজ্জাদ। শহরটা দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছে সে। এতোদিন যে দেশে কাটিয়ে এলো, সেদেশ আর এ দেশে কত তফাৎ। স্কুটারে বসে বসে এ সব কথাই ভাবছিলো সে।

এগিয়ে আসছে সাজ্জাদের স্কুটার।

এমন সময় রেলওয়ে গেট্‌টা বন্ধ হয়ে যায়। ট্রেন আসছে।

অন্যান্য যানবাহনের সঙ্গে সাজ্জাদের স্কুটার থেমে যায়।

একটা রিক্সাও এসে দাঁড়ালো স্কুটারের পাশে। রিক্সায় বসে রয়েছে সালেহা, হাতে সেলিমের দেওয়া বইগুলি ধরা রয়েছে।

সালেহার রিক্সা থামতেই অন্য একটি রিক্সা এসে ধাক্কামারে। সালেহা পড়তে পড়তে বেঁচে যায়।

অন্যান্য লোকজন তাকায় সালেহার দিকে।

পিছনের রিক্সা ওয়ালা ক্ষমা চায় সালেহার কাছে।

সালেহা ক্ষমা করলেও সালেহার রিক্সা চালক ক্ষমা করে না। কলহ বাধায়।

পাশের লোক জন থামিয়ে দেয়।

সাজ্জাদ চোখের গগলস্ খুলে তাকায় সালেহার দিকে।

সালেহাও তাকালো সাজ্জাদের দিকে। অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সালেহা। ঐ মুখ খানা যেন তার কাছে পরিচিত বলে মনে হয়।

সাজ্জাদও তাকিয়ে আছে স্থির দৃষ্টি মেলে, একই প্রশ্ন তার মনেও। মেয়েটিকে যেন অতি পরিচিত বলে মনে হয়।

সালেহা দৃষ্টি নত করে নেয়।

ট্রেন চলে যায়।

গেটম্যান গেট খুলে দেয়।

সাজ্জাদের স্কুটার চলে যায়।

সালেহা ভাবে ওকে ঠিক্ যেন তার সাজ্জাদের মত মনে হলো। তবে কি……সালেহার ভাবনার তালে তালে রিক্সা এগিয়ে চলে।

সেলিম একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে একমুখ ধুঁয়া উপরের দিকে ছুড়ে দিয়ে সোফায় ভাল করে ঠেশ দিয়ে বসে। একটু আগে সালেহাকে নিয়ে মায়ের কথাগুলিই গভীর ভাবে চিন্তা করে সে।

সালেহাকে মায়ের বড় পছন্দ। ওকে পেলে মা খুব খুসী হবেন। এমনি একটি মেয়েই তিনি কামনা করে এসেছেন।

সালেহার কথা ভাবতে সেলিমের বড় ভাল লাগে। ওর ডাগর দু'টি চোখের চাহনী তার সমস্ত হৃদয়কে জয় করে নিয়েছে। অনেক দিন সেলিম ওকে পড়া বুঝিয়ে দিতে গিয়ে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে তাকে। এতো দেখেও যেন সাধ মেটেনি ওর।

সালেহা সেলিমকে এমন ভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে লজ্জায় জড়ো সড়ো হয়ে পড়েছে। সংকোচে নুইয়ে এসেছে মাথাটা।

সেলিম অনেক দিন থেকে সালেহাকে কিছু বলবে ভেবেছে, কিন্তু সে বলতে পারেনি। কারন, সালেহার দিক থেকে কোন দিন সেলিম এতো টুকু কিছু সাড়া পায়নি।

সালেহা যেন নীরর প্রস্তর মূর্তি।

অনেক সময় ভেবেছে সেলিম সালেহার কি প্রান নেই। তার মধ্যে কি নেই প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-ভালবাসা। নীরস কঠিন বলে মনে হয়েছে ওকে।

বহুদিন সেলিম সালেহাকে নির্জনে পেয়েছে। সেলিমের মধ্যে একটা উন্মত্ত ভালবাসা তাকে অস্থির করে তুলেছে। সালেহাকে নিজের করে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে সে।

কিন্তু সালেহা ধীর স্থির নিশ্চুপ। শুধু পড়াই সে বুঝিয়ে নিয়েছে। তা'ছাড়া আর কোন কিছু বলবার সুযোগ সে দেয়নি সেলিমকে।

সালেহা চলে গেছে।

কিন্তু সেলিম আর ঘুমোতে পারেনি। সালেহার সেই হাস্য উজ্জ্বল মুখখানি, আর ডাগর দু'টি চোখের চাহনী তার গোটামনকে আছন্ন করে রেখেছে।

সেলিম ভাল বেহালা বাজাতে জানতো।

যখন চোখে ঘুম আসতোনা তখন সে বেহালা নিয়ে বসতো। আপন মনে বেহালা বাজাতো। সেলিমের বেহালার সুরের আবেশে রাতের অন্ধকার খান খান হয়ে ভেংগে পড়তো। এক মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি হতো সেখানে।

এমনি কত রাতের পর রাত সেলিম বেহালা বাজাতো।

সেলিমের আব্বাও বেহালা বাজাতে জানতেন, সেলিম তারই কাছে বেহালা বাজানো শিখেছিলো।

সেলিম বেহালাটা কাছে টেনে নিতে যায়, ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে কার যেন কণ্ঠ স্বর শুনতে পায়—সেলিম সাহেব বাড়ী আছেন?

সেলিম উঠে আ'সে—আরে সাজ্জাদ তুই—তা দেরী করলি যে বড়?

হেসে বলে সাজ্জাদ—রেলওয়ে গেট্ পড়লে তো জানিস্। আটকে রেখেছিলো কতক্ষন।

আর একটু আগে এলে একটি মেয়ের সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দিতুম।

সাজ্জাদ হেসে বলে—কেরে?

সে একজন, পরে বলবো।

দুই জনই হাসে।

সেলিম বলে—বস্ সাজ্জাদ। মাকে খবর দি।

সেলিম গিয়ে মাকে ডেকে আনে।

এই যে বাবা সাজ্জাদ কখন এলে? কথাটা বলতে বলতে কক্ষে প্রবেশ করেন সেলিমের মা।

সাজ্জাদ উঠে দাঁড়িয়ে বলে—ছালাম খালা-মা।

বসো বাবা, বসো। তোমার আব্বা ভাল আছেন তো?

জি হাঁ। বলতে বলতে বসে সাজ্জাদ।

সেলিম হেসে বলে—মা বসো, সাজ্জাদের কাছে আজ গল্প শুনবো।

তোরা বসে গল্প কর বাবা, আমি সাজ্জাদের জন্য চা নাস্তা নিয়ে আসি।

তাড়াতাড়ি এসো মা। দেরী করোনা যেন, সাজ্জাদের কাছে অনেক নতুন কথা শুনবার আছে।

আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। হাসতে হাসতে বেরিয়ে যান সেলিমের মা।

সাজ্জাদ আর সেলিম মুখোমুখি বসে।

সেলিম সিগারেট কেসটা এগিয়ে ধরে সাজ্জাদের দিকে—নে শুরু কর?

সেলিমের ওখান থেকে ফিরতে সন্ধ্যা বনিয়ে গেলো সাজ্জাদের।

হলঘরের বারান্দায় পা দিতেই সাজ্জাদের কানে এলো মামার কণ্ঠস্বর—সাজ্জাদের আসার কথা শুনে এলাম। তাহলে ভাই সাহেব আগামী মাসেই দিনটা ঠিক করে ফেলি?

পিতার গলার আওয়াজ—অতো তাড়া হুড়ো কিসের। সাজ্জাদ সবে বিলেত থেকে চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্সি পাশ করে এলো। আপনার মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের কথা যখন আমি দিয়ে রেখেছি……

মামার কণ্ঠ—হ্যাঁ ভাই সাহেব আপনার কথার উপর ভরসা করেই আছি। কত জায়গা থেকে সম্বন্ধ এলো। আত্মীয়ের মধ্যে হয়ে যায় সেই ভাল।

তমিজউদ্দিন সাহেবের গলা—এক মাত্র ছেলে আমার। মা মরা ছেলে—ও যাতে সুখে থাকে সেই ব্যবস্থা আমাকেই করে যেতে হবে।

মামা বলেন—জুলেখা বোন থাকলে……মামা বুঝি চোখ মুছছেন। কারন, তার বোনের কথা স্মরণ হয়েছে।

হাঁ সাজ্জাদের মা আজ বেঁচে থাকলে ওর সম্বন্ধে আমাকে এতো ভাবতে হতোনা……পিতার কণ্ঠস্বর ধরে এসেছে বলে মনে হলো সাজ্জাদের কাছে।

মায়ের কথা মনে পড়তে সাজ্জাদের মনটাও ভারী হয়ে উঠলো, সে আর দাঁড়াতে পারলোনা চলে গেলো নিজের ঘরে।

ছোট বেলায় মাকে হারিয়েছে সাজ্জাদ। আজ আর মাকে তেমন করে মনে পড়েনা। তবু মায়ের কথা স্মরন হলে মনটা খারাপ হয়ে যায়।

সাজ্জাদ জামা কাপড় খুলে বাথরুমে প্রবেশ করলো। হাতমুখ ঠাণ্ডা পানিতে পরিস্কার করে ধুয়ে নিজের বিছানায় গা এলিয়ে দিলো।

হলঘরে মামার কথাগুলি কানের কাছে ভেসে উঠলো। মামা এসেছেন তার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে। নিজের মনেই হাসলো সাজ্জাদ। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেলো…রেলওয়ে গেট পড়ে গেলে রিক্সার সেই মেয়েটির কথা। কোথায় যেন দেখেছিলো ওকে। ওই চোখ দুটোর কথা আজও যেন মনে আঁকা রয়েছে। সেকি তবে সালেহা। তার শৈশবের সাথী সালেহা। কিন্তু এখানে আসবে সে কি করে। না বিশ্বাস হচ্ছেনা।

এখানে সাজ্জাদ যখন সালেহাকে নিয়ে চিন্তার জাল বুনছে। সেই মূহূর্তে সালেহাও নিজের পড়ার টেবিলের পাশে বসে ভাবছে····· ওই মুখখানা তার যেন অতি পরিচিত বলে মনে হলো। সেই ছোট্ট সাজ্জাদের মুখ খানাই যেন দেখতে পেলো ঐ মুখ খানার মধ্যে। তবে কি এই সেই তার সাজ্জাদ। সেই নাক, সেই মুখ·····আবার যদি দেখা হতো ওর সঙ্গে·····

এমনি করে সালেহা ভাবে সাজ্জাদের কথা, আর সাজ্জাদ ভাবে সালেহার কথা।

দু'জনার কাছথেকে দু'জনা বিচ্ছিন্ন আজ বহুদিন। তবু তারা ভুলতে পারেনি একজন অপর জনকে। যদিও কালের অতলে তলিয়ে গিয়েছিলে একে অপরের কাছ থেকে। কিন্তু মনের নিভৃত কোনে জেগেছিলো ওরা জ্বলন্ত প্রদীপের মত।

আজ সালেহা আর সাজ্জাদের আকস্মিক সাক্ষাৎ আবার নতুন করে আলোড়ন জাগায় উভয়ের মনে।

সাজ্জাদ শুয়ে শুয়ে তখনকার মেয়েটির কথাই ভাবছিলো। এমন সময় মান্নান কক্ষে প্রবেশ করে বলে—একি ছোট সাহেব শুয়ে আছো যে ?

মাথাটা ধরেছে।

তা ধরবেনা সাড়াটাদিন বিশ্রামের নাম মুখে আনবেনা। শুধু বন্ধু বান্ধব আর দেখা সাক্ষাৎ। বলি হাত মুখ ধুয়েছো ছোট সাহেব ?

ধুয়েছি। মান্নান ভাই এককাপ চা দিতে পারো।

তা আর পারবোনা। দিচ্ছি। বেরিয়ে যায় মান্নান।

সাজ্জাদ এবার উঠে পড়ে।

ড্রেসিং গাউন পরে মুক্ত জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় সে, গুন গুন করে গান ধরে। মনটা তার বেশ প্রফুল্ল লাগছে। একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে সাজ্জাদ।

এমন সময় মান্নান চায়ের কাপ নিয়ে হাজির হয়—ছোট সাহেব চা।

সাজ্জাদ গুনগুন করে গান গাইছিলো, ফিরে দাঁড়িয়ে বলে—চায়ের কথা বলেছিলাম নাকি ?

বলেছিলে মানে—জোর গলায় বলেছিলে। আমার আনতে যা একটু দেরী হলো—এই যা।

আচ্ছা দাও।

সাজ্জাদ মান্নানের হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে চুমুক দেয়।

মান্নান বলে—চা খেয়ে হলঘরে যাও। মামা এসেছেন দেখা করে এসো।

আচ্ছা তুই যা, আমি আসছি।

বেরিয়ে যায় মান্নান।

মেডিক্যাল হস্‌পিটাল্।

সার্জিক্যাল ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে আসে সেলিম। গায়ে এ্যাপ্রন হাতে স্টেথস্‌কোপ। এগিয়ে যায় সে সম্মুখের দিকে। উজ্জ্বলদীপ্ত তার মুখ মণ্ডল।

হসপিটাল্ করিডরে পৌঁছতেই সালেহার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় সেলিমের। সালেহার শরীরেও এ্যাপ্রণ হাতে বই আর স্টেথস্‌কোপ। সালেহা সেলিমকে দেখতে পেয়েই বলে—এই যে আপনার বই আর নোট খাতাটা।

হেসে বলে সেলিম—থাকনা পরে দেবেন।

পরে যখন দরকার হবে আবার নিয়ে আসবো। বই আর নোটের খাতাটা সেলিমের হাতে দেয় সালেহা।

সেলিস বই হাতে নিয়ে বলে—মা কিন্তু সব সময় আপনার কথা বলেন।

হাঁ খালামাকে আমারও ভাললাগে। ছোট বেলায় মা বাবা মরে গেছেন। মা বাবার স্নেহ কি জিনিস জানিনা।

একটা কথা ছিলো—অনেক দিন থেকেই বলবো বলবো ভাবছি—

এমন সময় অন্য একটি ছেলে এগিয়ে আসে। সেলিমকে লক্ষ্য করে বলে—হ্যালো সেলিম—

কথার মাঝখানে বাধা পায় সেলিম। মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখ মণ্ডল প্রসন্ন করে নিয়ে বলে—হ্যালো।

সালেহা সেলিমকে লক্ষ্য করে বলে—আচ্ছা সেলিম সাহেব আমি ৬নং ওয়ার্ডের দিকে যাচ্ছি। সালেহা চলে যায়।

ছেলেটি বলে উঠে—তোদের আলাপের ব্যাঘাত করলাম না তো?

তা একটু করেছো বৈ কি।

সরি!

হঠাৎ কি মনে করে—

আমার এক আত্মীয় আছে ৬নং ওয়ার্ডে তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো একটু দেখা শোনা করবি—এই আর কি।

সেলিম বলে—চল্।

সেলিম বন্ধুর সঙ্গে এগিয়ে চলে। মনটা কিন্তু এখনও তার স্বচ্ছ হয়নি। এমনি আরও কত দিন সালেহাকে মনের কথা জানাতে গিয়েছে সেলিম, অমনি একটা না একটা বাধা এসে তার ভাষাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। নীরাশ হয়েছে সে।

হস্‌পিটাল থেকে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায় সেলিমের।

বাসায় প্রবেশ করতেই মা বললেন—এতো রাত হলো যে বাবা?

হেসে বলে সেলিম—ছুটি আমার অনেকক্ষণ হয়ে গিয়ে ছিলো মা, কিন্তু একটা কঠিন রোগী ছিলো…তাই…

বুঝেছি। হাত মুখ ধুয়ে খাবার টেবিলে যাও। আমি আসছি।

সে কি মা তুমিও খাওনি?

না বাবা। একা একা খেতে পারি না।

রোজ আমার দেরী হবে আর তুমি না খেয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করবে? না মা এ সব আর করো না।

পাগল ছেলে তুই বুঝবিনে। চল্—

চল—মা—

খেতে খেতে মা আর ছেলের মধ্যে অনেক কথা হয়। তার আব্বা আলম সাহেবের কথা বলেন মা—তিনিও এমনি রাত করে বাড়ী ফিরতেন। অফিসের ছুটি হলেও তিনি বসে বসে কাজ করতেন, এমন কি কোন দিন বাড়ী ফিরবার কথাও স্মরণ থাকতো না তার। কাজ শেষ করে তবে তিনি ঘড়ির দিকে তাকাতেন। তখন হয়তো রাত অনেক হয়ে গেছে।

অফিসের অন্যান্য কর্মচারীগণ মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হয়ে পড়তেন। কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু বলতে পারতেন না। কারণ আলম সাহেব ছিলেন ন্যায়ের প্রতীক।

তিনি তো মন্দ কিছু করছেন না। মালিকের মঙ্গলই ছিলো তাঁর কামনা। অনেক রাতে বাড়ী ফিরেও কি তাঁর স্বস্তি ছিলো! চারটি নাকে মুখে গুজে দিয়ে আবার বেহালা নিয়ে বসতেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতো, ভোরের পাখী কল রব করে উঠতো তবু ধ্যান গ্রস্থের মত বেহালার বুকে সুরের সৃষ্টি করে চলেছেন তোর আব্বা।

একটু থেমে বলেন মা—তাঁরই তো ছেলে তুই। নিজের দিকে তাকাবি না, শুধু কাজ আর কাজ···তিনি মেতে থাকতেন অফিসের কাজ আর বেহালা নিয়ে, আর তুই মেতে থাকিস্ তোর রোগী পত্তর নিয়ে···

এ যে ডাক্তারের কর্তব্য মা। রোগীর সেবাই যে আমাদের ধর্ম।

তাই বলে ডিউটির পরও তুই.....

ও কথা বলো মা। তোমার ছেলে কর্তব্যের দাস।

খাওয়া শেষ করে সেলিম উঠে পড়ে।

নিজের ঘরে গিয়ে শোয়।

কিন্তু বহুক্ষণ চেষ্টা করেও চোখে ঘুম আসে না। নিজের অজ্ঞাতে কখন যে সেলিম বেহালা নিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে খেয়াল নেই।

আপন মনে বেহালা বাজিয়ে চলেছে সেলিম।

মা এসে দাঁড়ান ছেলের পিছনে, হাতে তাঁর চায়ের কাপ—খোকন, এখনও তুই ঘুমোসনি এই যে তোর চা ঢাকা থাকলো।

বেহালা বাজাতে-বাজাতেই বলে সেলিম—রেখে যাও মা।

মা একটু দাঁড়িয়ে বলেন—তোর বাবার মতই তোরও ঐ একই নেশা, রাত করে বেহালা বাজানো।

মায়ের কথায় সেলিম শুধু হাসলো। কিন্তু তার বেহালার সুর তেমনি এক'টানা বেজে চললো।

সেদিন মেডিক্যাল কলেজ থেকে একটা রিক্সায় ফিরছিলো সালেহা।

সাজ্জাদ হঠাৎ ওকে দেখে ফেলে, ভাবে এই তো সেই মেয়েটি, যাকে একদিন রেলওয়ে গেট পড়লে দেখেছিলো সে।

সাজ্জাদ তাড়াতাড়ি একটা স্কুটার ডেকে উঠে বসে ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে—ঐ রিক্সার পিছু চলো।

স্কুটারে ষ্টার্ট দেয় ড্রাইভার।

ফিরে তাকায় সালেহা। সাজ্জাদকে দেখতে পেয়েই চমকে উঠে সে। ঐ তো সেই ছেলেটি। নিশ্চয়ই সেই.....

সাজ্জাদ ও স্কুটারে চেপে বসে ভাবছে—আজ দেখে নেবে কোথায় থাকে মেয়েটি।

সালেহা ভাবে রিক্সা থামিয়ে কি জিজ্ঞাসা করে দেখবো। কেনো সে আমার পিছু নিয়েছে। বলবো—কে আপনি কিন্তু আমি আগে কথা বলবো না। যদি সত্যই সে হয়···সালেহার চিন্তার বিরাম নেই।

সাজ্জাদের মনেও চিন্তার অভাব নেই। একবার জিজ্ঞাসা করে দেখলে মন্দ হয় না। আপনার নামটা কি? কিন্তু সে যদি না হয়।

সালেহা রিক্সা চালককে লক্ষ্য করে বলে—বাঁ দিকে যাও।

রিক্সা বা দিকের গলিতে প্রবেশ করতেই, সাজ্জাদ স্কুটার রুখতে বলে। তারপর নিজ মনেই বলে উঠে সে—এই খানে থাকে। যদি তুমি সেই হও—যেখানেই থাকো খুঁজে তোমাকে বের করবই। এবার স্কুটার ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলে—স্কুটারের মুখ ফেরাও।

সালেহা বাড়ীর দরজায় এসে রিক্সা থেকে নেমে দাঁড়ালো।

পয়সা মিটিয়ে দিয়ে তাকালো পিছনে। না সে আর আসেনি। মোড়ের বাঁকেই স্কুটার ফিরিয়ে নিয়েছে।

উঠানে প্রবেশ করতেই বুড়ি মা বললো—আজ যে বড় খুব খুসী লাগছে! বলি ব্যাপার কি?

সালেহার মনে সত্যি আজ খুসীর জোয়ার।

একটা অনাবিল আনন্দ তার মনকে উজ্জল করে তুলেছে। বুড়ি মাকে জড়িয়ে ধরে বলে—বলবো আর একদিন, আজ নয়।

তা ছাড়ছিনে সই বলতে হবে—হেঁ?

কিছু না।

তোর মুখই বলেদিচ্ছে—আজ যেন তুই কারো দেখা পেয়েছিলি…

মিছেমিছি সন্দেহ করছো সই। তেমন কিছু নয়।

তা তো আমি বুঝতেই পারছি।

সালেহা ততক্ষনে ঘরে গিয়ে ঢুকেছে।

পড়ার টেবিলে বসে ভাবে সালেহা……এতোদিন শহরে এসেছি, তাকে তো কোনদিন দেখিনি। কোথায় লুকিয়ে ছিলো সে। গুনগুন করে গান গায় সালেহা।

বুড়ি মা কখন যে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, হেসে বলে—কি হচ্ছে সই?

বললুম তো, বলবো পরে……কথাটা বলে বুড়ি মার গালে মৃদু টোকা দেয় সালেহা।

সালেহা আর বুড়ি মা যখন হাসা হাসি করছিলো—সেই সময় সাজ্জাদ আর মান্নাননের মধ্যেও চলেছে তেমনি হাসির ছড়া ছড়ি।

সাজ্জাদ শোবার ঘরে গিয়ে একটা সোফায় গা এলিয়ে দেয়। তার চোখের সম্মুখে তখন সালেহার মুখ খানা ভাসছে। গুনগুন করে গান গায় সে। আজ তার একটা নতুন আনন্দের ঢেউ বয়ে চলে।

মান্নান একটা গেলাসে দুধ নিয়ে তার পিছনে এসে দাঁড়ায়। হেসে বলে—বলি আজ এতো খুসী খুসী কেনো ছোট সাহেব ?

সাজ্জাদ গানের সুরে সুরে মান্নানকে বুঝিয়ে দেয় তার মনের কথা। হাসে মান্নান।

তারপর সাজ্জাদের গান গাওয়া শেষ হলে বলে—দাও দুধ দাও। মান্নানে হাত থেকে দুধের গেলাসটা নিয়ে এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলে। তারপর গেলাসটা মান্নানের হাতে ফেরৎ দিয়ে বলে—যাও।

মান্নান গেলাস হাতে চলে যাচ্ছিলো।

সাজ্জাদ ডাকে—মান্নান ভাই শুনে যাও।

থেমে পড়ে মান্নান—আমায় ডাকছো ছোট সাহেব ?

হাঁ শোন।

মান্নান সাজ্জাদের কাছে এসে দাঁড়ায়—কি বলছো ?

আচ্ছা মান্নান ভাই তোমার চন্দনপুর গ্রামের কথা মনে আছে ?

হুঁ আছে। সেই গ্রামে তোমার খেলার সাথী সেই ছোট্ট মেয়ে সালেহাকেও মনে আছে। কি দুষ্ট ছিলে তোমরা।

সাজ্জাদ মান্নানকে ধরে বলে উঠে—মনে আছে! সত্যি মান্নান ভাই মনে আছে তোমার ? একটা কাজ করবে ?

নিশ্চয়ই করবো! বলো কি করতে হবে ?

এখানে আমি যাকে দেখেছি—সে সালেহা কিনা…

তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ছোট সাহেব। সে এখানে আসবে কি করে। তার হয়তো কোথায় বে-থা হয়ে চলে গেছে ? বেঁচে আছেই কি মরে গেছে……

বাধা দিয়ে বলে উঠে সাজ্জাদ—না না ও সব বলোনা। তোমাকে একবার ওর খোঁজ নিতে হবে। কোথায় থাকে আমি দেখে এসেছি।

বলো কি আমি খোঁজ নেবো। শেষে কে না কে, ধরে মার ধর দিক আর কি।

সাজ্জাদ মাথা চুলকায়, তাই তো হঠাৎ একটা মেয়েকে তার সেই সালেহা ভেবে.....না না তা হয় না। তবে কি করা যায়। সাজ্জাদ ভাবতে থাকে। তারপর হঠাৎ বলে উঠে—হ্যাঁ একটা বুদ্ধি আমার মাথায় এসেছে, শোন—

মওলামিয়া দুঃখ করে—লোকে বলে আমি খারাপ। আমি লম্পট। আমি মদ খাই—কিন্তু কেনো খাই তা কেউ জানেনা।

মওলার দোস্ত আফগানী হেসে বলে—নে চুপ কর্। লোকে বললো তো কি হলো।

মওলামিয়া হাসে, করুণ বৃথা ভরা হাসি। তারপর একটা দীর্ঘ-শ্বাস ত্যাগ করে বলে—সবাই তো জানেনা আমি কেনো মদ খাই। আফগানীকে ধরে বলে উঠে—তুই বিশ্বাস কর্ আমি ওকে ভাল বেসে বিয়ে করেছিলাম—কিন্তু ওযে আমাকে ফাঁকি দিয়ে আর এক জনের সঙ্গে চলে যাবে.....

গেছে আপোদ গেছে.....হাসে আফগানী।

এমন সময় গেঞ্জি গায়ে হাতে টর্চ নিয়ে একটি লোক-সেখানে উপস্থিত হয়। মওলামিয়া আর আফগানীকে লক্ষ্য করে, বলে—তোদের এ তামাসা কি সারা রাত চলবে? কটা-বাজে জানিস্?

মওলামিয়া বলে উঠে—ক'টা বাজেরে বলতে পারিস্?

লোকটি গম্ভীর গলায় বলে—রাত তিনটে।

চমকে উঠে মওলামিয়া—বলিস কিরে! রাত তিনটে বেজে গেছে। উঠে দাঁড়ায় সে—জিভে কামড় দেয়, কান ধরে তারপর বলে—চল্ চল্। আমার জন্য সালেহা হয়তো বসে আছে।

আফগানী বলে উঠে—ওকে তুই এতো ভয় করিস্ কেনোরে মওলা?

কে-নো যে করি তোরা বুঝবিনে। যত আমার ভয় ঐ ওকে। বোনটা আমার বড্ড খামখেয়ালী.....হাসে মওলা মিয়া।

লোকটি বলে উঠে—আচ্ছা মওলা বলতে পারিস বোনকে ডাক্তারী পড়ায়ে তোর কি লাভ হবে ? ডাক্তার হয়ে, চলে যাবে পরের ঘরে। তুই তখন খাবি কচু.....

আমি কি ওর টাকা খাবার জন্য ওকে পড়াচ্ছি তোরা ভাবিস্ ?

তা নয়তো কি। টাকাই তো চাই.....

না। ওকে আমি ডাক্তার করছি ওরই ভালর জন্য। তারপর ভাবাপন্ন কণ্ঠে বলে মওলামিয়া—ডাক্তারী পাশ করে সালেহা মস্ত ডাক্তার হবে...কত রোগী আসবে ...সালেহা তাদের ঔষধ দিয়ে ভাল করবে...সেদিন আমার কত আনন্দ হবে জানিস ?

নে নে চল্ এবার। বলে পা-বাড়ায় আফগানী।

মওলামিয়াও এগয়—চল্। হঠাৎ পেটের ব্যথায় পেট চেপে ধরে —ইস্ বাবাগো।

লোকটা বলে উঠে—কি হলোরে মওলা ?

বড্ড ব্যথা।

আফগানী বলে—ও সেরে যাবে চল্ চল্.....

বাড়ী পৌঁছে মওলামিয়া চুপ চুপ করে শুতে যাচ্ছিলো। হঠাৎ আলোটা পায়ে লেগে পড়ে যায়। অমনি জেগে উঠে সালেহ—কে !

আমি।

কে ভাইয়া! এসেছো ? এতো রাত করে এলে ?

মাথা চুলকায় মওলামিয়া—আজ হোটলে বড্ড ভীড় পড়ে ছিলোরে। কথা তাড়াতাড়ি শেষ করে ঘরের দিকে চলে যাচ্ছিলো সে। হঠাৎ হোচট্ খেয়ে পড়তে যায়।

সালেহা অমনি ধরে ফেলে।

মওলামিয়া নেশা করে এসেছিলো, গন্ধটা সালেহার নাকে প্রবেশ করতেই বুঝতে পারে তার এতো নিশেধ স্বর্তেও মওলামিয়া আবার সরাব খেয়েছে। অভিমানে ভরে উঠে সালেহার মন।

মাওলামিয়া নিজকে সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। মনে পড়ে সালেহা তাকে বার বার নিশেধ করা স্বর্তেও আবার সে নেশা করেছে। নিশ্চয়ই সালেহা আজ তাকে ক্ষমা করবে না। লজ্জায় ভয়ে সঙ্কুচিত হয় মাওলামিয়া। সালেহার মুখের দিকে তাকাতে সাহস পায় না সে। তাড়াতাড়ি চলে যায় নিজের ঘরে।

সালেহা গম্ভীর স্থির দৃষ্টি মেলে শুধু তাকিয়ে থাকে, কোন কথা সে বলে না।

মাওলামিয়া ঘরে চলে যেতেই সালেহা ফিরে আসে নিজের ঘরে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে সে, ভাবে মাওলামিয়া তার এতো বারণ স্বর্তেও আবার মদ খেয়েছে। তবে কি কোন দিন তাকে এই নেশা ছাড়াতে পারবে না সে।

পরদিন।

মান্নান আর সাজ্জাদ এসে দাঁড়ালো মোড়ের বাঁকে।

সাজ্জাদ পকেট থেকে একটা কাগজের নৌকা বেরকরে মান্নানের হাতে দিয়ে বলে—ঐ যে বাঁ দিকে যে বাড়ীটা...বুঝেছো ?

বুঝেছি। পা টিপে টিপে এগয় মান্নান।

সাজ্জাদ চারিদিকে তাকিয়ে সরে দাঁড়ায়।

মান্নান সাজ্জাদের দেখিয়ে দেওয়া দরজাটায় টোকা দেয়। ঠক্ ঠক্ ঠক্...

ভিতর থেকে ভেসে আসে মাওলামিয়ার কণ্ঠ—কে ?

মান্নান আবার টোকা দেয়—ঠক্ ঠক্...

দরজা খুলে বেরিয়ে আসে মাওলা মিয়া। মান্নানকে দেখে বলে—কি চাই ?

আমি মান্নান। আচ্ছা এখানে সালেহা বলে কেউ থাকে ?

আমার বোন।

মান্নান কাপড়ের তলা ছেকে কাগজের নৌকাখানা বের করে মওলা মিয়ার সম্মুখে ধরে—এটা আমাদের ছোট সাহেব সাজ্জাদ দিয়েছেন। আপনার বোনকে দেবেন—

মওলা মিয়া রেগে আগুন—দেখো মিয়া ও কাগজের নৌকাই কও, আর ময়ুর পঙ্খী নৌকাই কও, পানির জিনিস পানিতেই ভাসাও গে। এখানে কোন সুবিধে হবে না। যাও। স্বশব্দে দরজা বন্ধ করে দেয় মওলা মিয়া।

মান্নান ভয়ে জড়ো সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সাজ্জাদ হাতের ইশারায় মান্নানকে ডাকে।

মান্নান সরে এসে দাঁড়ায় সাজ্জাদের সম্মুখে।

সাজ্জাদ ব্যস্ত কণ্ঠে বলে—কি হলো?

আর একটু হলেই হয়েছিলো আর কি!

পারলেনা। নাঃ তোমার দ্বারায় কিচ্ছু হবে না। এতো বড় বোকা তুমি।

সাজ্জাদ আর মান্নান যখন গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা হাচ্ছিলো।

তখন মওলা মিয়া উঠানে প্রবেশ করে আপন মনেই বলছে—ছেলে মানুষ পেয়েছে। ভেবেছে আমি কিচ্ছু বুঝি না। যত সব ইয়ে...

ঘরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে সালেহা—কি হয়েছে ভাইয়া।

এই যে দেখনা—কোথাকার কে সাজ্জাদ না কে ছোট সাহেব একটি কাগজের নৌকা পাঠিয়েছে—বলে কি বোন কে দিও। ব্যাটা তামাসা করার জায়গা পাওনা। মেরে হাড় গুড়ীয়ে দেবো না.....

সালেহা বলে উঠে—সাজ্জাদ—কাগজের নৌকা—এ তুমি কি বলছো ভাইয়া?

হারে-হা, ঐ মান্নান না কি যেন নামটা বললো, সেই তো এনেছিলো—ঐ কাগজের নৌকাটা.....

সালেহার মুখ মণ্ডল উজ্বল দীপ্ত হয়ে উঠে, বলে সে—মান্নান ভাই এসেছিলো?

কিরে চিনিস্ নাকি ?

সালেহা নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মওলা মিয়া বলে উঠে—কি জানি বাপু—অতো শত বুঝিনা। দেখি আবার যদি কখনও দেখা হয়—

সেদিন সেলিমের ড্রইংরুমে বসে দুই বন্ধুর গল্প হচ্ছিলো। সাজ্জাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু সেলিম। এক কথায় বলতে গেলে উভয়ে তারা প্রাণের প্রাণ। দু'জনার মনের কথা দু'জনা জানে।

সেদিন রেলওয়ে গেট পড়লে যে মেয়েটাকে সাজ্জাদ দেখেছিলো, তারপর থেকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে সাজ্জাদ সেলিমের কাছে। এমন কি মান্নানকে দিয়ে কাগজের নৌকা পাঠানোর কথাটা পর্যন্ত বলে সাজ্জাদ ওর কাছে।

সব শুনে হাসে সেলিম, হাসি থামিয়ে বলে—শেষে মান্নানকে দিয়ে প্রেম সাগরে তরী ভাসাতে পাঠিয়েছিলি—তাও আবার কাগজের নৌকা দিয়ে……আবার হাসে সেলিম—বলিহারি তোর বুদ্ধি।

সাজ্জাদ গম্ভীর কণ্ঠে বলে—কর্ ঠাট্টা। আমার মত যদি অসহায় অবস্থায় পড়তিস্—বুঝতিস্ মজাটা।

সেলিম হাত জোড় করে বলে—দোহাই বাবা, ও অবস্থায় আমি পড়তে চাইনে……

তোর টা কই তো দেখালিনে ?

সময় আসুক নিশ্চয়ই দেখাবো। তুই আমার প্রাণের বন্ধু তোকে না দেখিয়ে পারি ?

রসিকতা নয় সেলিম, ওকে আমি ছোট থেকে জানি। আমি ওকে ভাল বাসতাম ও আমাকে ভাল বাসতো। শুধু এই উপকার টুকু তুই আমার করবি, আমি জানতে চাই সে কোন দিন চন্দনপুর গ্রামে ছিলো কিনা ? আর সাজ্জাদ বলে কাউকে চিনতো কিনা—

না ভাই এ আমার দ্বারা হবে না। মান্নান তবু বহাল তবীয়তে ফিরে এসেছে। তার যে অবস্থার কথা শুনলাম, ওখান থেকে দ্বিতীয় বার ফিরে আসা—

Library,
COLLEGE OF HOME ECONOMICS,
Dacca.

যাক গে চল্ সিনেমা দেখে আসি।

গুলিস্তানে।

কি ছবি হচ্ছে ?

আই লাভ ইউ লাভ।

হাসে সেলিম—আমি ভালবাসী—তুমিও ভালবাস। চল যাওয়া যাক্।

ছবি দেখা শেষ করে সেলিম আর সাজ্জাদ একটা হোটেলে গিয়ে ঢুকলো।

সেলিম সাজ্জাদকে লক্ষ্য করে বলে কি খাবি বল্

সাজ্জাদ বলে—যা ভাল মনে করিস্।

সেলিম আর সাজ্জাদ একটা কেবিনে গিয়ে বসে। সেলিম ডাকে —এই বেয়ারা……

মওলামিয়া এগিয়ে আসে—হাঁ সাহাব।

মওলা মিয়া সেলিমের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়।

সেলিম সাজ্জাদকে লক্ষ্য করে বলে—সাজ্জাদ কি খাবি বল্ ?

যা হয় ওর্ডার দিয়ে দে।

মওলা মিয়া ভাবে…সাজ্জাদ…এই নামটাই তো কাল সে শুনেছে। তবেকি এই সেই সাজ্জাদ…মওলা মিয়া সেলিমের ওর্ডার মত খাবার এনে টেবিলে সাজিয়ে দেয়।

সেলিম আর সাজ্জাদ খেতে শুরু করে।

তখনও মওলা মিয়ার মাথায় ঐ নামটা ঘুরপাক খাচ্ছিলো। হঠাৎ মওলা মিয়ার কানে আসে—প্রথমবাবু দ্বিতীয় বাবুকে বলছেন— নে শুরু কর। ওমন করে কি ভাবছিস্ তোর সেই কাগজের নৌকার কথা নাকি……

এবার মওলা মিয়ার চোখ দু'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠে…সাজ্জাদ…

কাগজের নৌকা···নিশ্চয়ই এই সেই সাজ্জাদ। সাহস করে এগিয়ে যায় মওলা মিয়া, বলে—সাহেব আপনার নাম সাজ্জাদ ?

হাঁ কেনো ?

আপনি—আপনিই কাগজের নৌকা পাঠিয়ে ছিলেন আমার বোনের কাছে ?

বোন ! তোমার বোন ? অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে সেলিম।

হাঁ সালেহা তো আমার বোন।

সেলিম পুনরায় বলে—এর কথা তুমি জানলে কি করে ?

কাল বিকেলে কে একজন লোক গিয়ে বলেছিলো, সাজ্জাদ সাহেব কাগজের নৌকা পাঠিয়েছেন·····

সেলিম এবার সাজ্জাদের পিঠ্ চাপড়ে দিয়ে বলে উঠে—সাব্বাস পেয়ে গেছিস্ সাজ্জাদ।

সাজ্জাদ মওলা মিয়াকে লক্ষ্য করে বলে—ও তুমি ! তারপর একটু থেমে বলে তোমার নাম কি ?

আমার নাম মওলা মিয়া।

এবার বলে সেলিম—সালেহা তোমার নিজের বোন ?

হাঁ—না ঠিক্ নিজের নয়—কিন্তু একদম নিজের মতই।

সাজ্জাদ বলে উঠে—তার মানে ?

মওলা মিয়া কেমন ভাবাপন্ন হয়ে যায়, তার পর বলে—সে অনেক কথা। একদিন আমার ওখানে যাবেন সব বলবো।

সেলিম টিপ্পনী কাটে—যা হোক তোর একটা হিল্লে হলো—কি বলিস্ ? নিশ্চয়ই এ তোর সেই সালেহা—

মওলা মিয়া তখন অন্য এক বাবুর ডাকে ওদিকে চলে গেছে।

সেদিন দুপুরে সালেহা একটা বই নিয়ে পাতা উল্টাচ্ছিলো। এমন সময় বাইরে রাস্তা থেকে ভেসে আসে চুড়িওয়ালীর কণ্ঠস্বর—চুড়ি নেবেগো—চুড়ি। কাঁচের চুড়ি। ভাল ভাল কাঁচের চুড়ি চাই·····

সালেহা বেরিয়ে আসে, দরজা খুলে ডাকে—এই চুড়িওয়ালী এদিকে এসো।

চুড়িওয়ালী ফিরে তাকায়—চুড়ি নেবে মা?

হাঁ এসো।

চুড়িওয়ালী ভিতরে আসে। চুড়ির ডালা খুলে বসে বলে—কই হাত দেখি?

সালেহা এদিক ওদিক তাকালো বুড়ি মার খোজে, কিন্তু বুড়ি মাকে দেখতে না পেয়ে ডাকে—সই—সই দেখে যাও, কাঁচের চুড়ি নেবো। —কাঁচের চুড়ি।

যাই লো যাই। আজ আবার কাঁচের চুড়ি পড়বার সখ হয়েছে? ওদিকের উঠান থেকে বলে বুড়ি মা।

সালেহা চুড়ি ওয়ালীকে লক্ষ্য করে বলে—দেখি ভাল দেখে চুড়ি বের করো তো?

বুড়িমা হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে—লাল চুড়ি দিওগো বাছা।

চুড়ি ওয়ালী ভাল ভাল লাল চুড়ি বের করে বেছে নিয়ে বলে—দেখি গো আমার মায়ের হাতটা।

সালেহা বসে হাতটা বাড়িয়ে দেয় চুড়িওয়ালীর দিকে।

চুড়িওয়ালী সালেহার হাতে চুড়ি পরিয়ে দিয়ে বলে উঠে—কি সুন্দর মানিয়েছে, মা তোমাকে। একেবারে রাজ কন্যের মত।

বুড়ি মা বলে—রাজ কন্যে নয়—রাজ কন্যে নয়, বলো রাজ রাণীর মত।

চুড়িওয়ালী দাম নিয়ে চলে যায়। সালেহা হাত দু'খানা দেখতে থাকে।

সালেহার মনে আজ খুসীর জোয়ার, সে তার সাজ্জাদের সন্ধান পেয়েছে। সাজ্জাদ—কাগজের নৌকা পাঠিয়েছিলো...নিশ্চয়ই সে তাকে চিনতে পেরেছে। আনন্দে আত্মহারা হয় সালেহা...ছুটে

যায় ঘরের মধ্যে। চুড়ি সমেত হাত দু'খানা চোখের সামনে উঁচু করে ধরে নাচতে শুরু করে। জীবনে বুঝি কোনদিন সে এতো আনন্দ পায়নি।

গান গায় আর নাচে সালেহা।

বুড়ি মা দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মিটি মিটি হাসে। সালেহার আনন্দে বুড়ি মা খুসী হয়। কেননা সালেহা এ বাড়ীতে আসা অবধি কোনদিন এমন করে আনন্দ প্রকাশ করেনি। হেসেছে কিন্তু এমন হাসি সে কোন দিন ওর মুখে দেখে নাই।

আজ সালেহার মনে যেমন আনন্দের উৎস বয়ে চলেছে—তেমনি খুসীতে আত্মহারা সাজ্জাদ—যে সালেহাকে সে এতোদিন অনুসন্ধান করে ফিরেছে—তার খোঁজ পেয়েছে সে।

সাজ্জাদ সেভ্ করছিলো আর গুন গুন করে একটা সুর আওড়াচ্ছিলো। মুখ মণ্ডল প্রফুল্ল আনন্দে উদ্ভাসিত।

ও পাশে বসে মান্নান সাজ্জাদের জুতো ব্রাস করছিলো।

জুতো ব্রাস শেষ করে বলে উঠে মান্নান—একেবারে আয়না—মান্নান জুতোর মধ্যে দাঁত দেখতে থাকে।

সাজ্জাদ জুতো জোড়া পায়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

মান্নান কোট টা এনে পরিয়ে দেয় সাজ্জাদের গায়ে।

সাজ্জাদ ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়।

মান্নান বলে—চমৎকার মানিয়েছে ছোট সাহেব। একেবারে খাসা—

মওলা মিয়া সালেহাকে এসে বলেছে সেদিন হোটেলে সাজ্জাদ তার এক বন্ধু এসেছিলো। কাগজের নৌকা নিয়ে আবার তাকে আসতে বলেছে মওলা মিয়া। কাল আসবে বলেছে সাজ্জাদ।

কথাটা শোনার পর থেকে সালেহার আনন্দ আর ধরে না। সালেহার আনন্দে বুড়ি মাও খুসী হয়েছে, আহা বেচারী সালেহা।

সালেহা বুড়ি মাকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠেছিলো। আজ আসবে সাজ্জাদ। খুব করে সেজেছে সালেহা।

বুড়ি মা হেসে বলে—আমাকেও একটু সাজীয়ে দে না সই।

এসো সাজিয়ে দি.....সালেহা পাউডার নিয়ে বুড়িমার মুখে মাখিয়ে দিতে থাকে।

এমন সময় কড়া নাড়ার শব্দ হয়।

মওলা মিয়াও আজ কাজে যায় নাই। সাজ্জাদ সাহেব আসবে এতে তারই কি কম আনন্দ। যত দূর পারে ঘর দোর গুছিয়ে তার বসবার জায়গা করে রেখেছে।

ওদিকে কেটলিতে চায়ের পানি টক্ বক্ করে ফুটছে। সালেহা সাজ্জাদের জন্য নিজ হাতে নাস্তা তৈরী করে রেখেছে। কত কি তৈরী করেছে সে।

মওলা মিয়া সব জোগার করে দিয়েছিলো।

সাজ্জাদের প্রতিক্ষায় বসে বসে ঝিমুচ্ছিলো সে। এমন সময় কড়া নাড়ার শব্দে ব্যস্ত ভাবে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেয়।

সালেহাও কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পেয়েছিলো। তাড়াতাড়ি একটা থামের আড়ালে এসে দাঁড়ায়।

বুড়ি মাও কখন যে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলো।

সালেহার দু'চোখে অফুরন্ত আনন্দ। আগ্রহ ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো।

কিন্তু মওলা মিয়া দরজার বাইরে গিয়ে ফিরে এলো একটা চিঠি নিয়ে।

মুহূর্তে সালেহার মুখ মণ্ডল বিষন্ন হলো। চোখ দু'টো কেমন ছল ছল হয়ে উঠে!

মওলা মিয়া মলিন মুখে একখানা চিঠি নিয়ে এগিয়ে এলো সালেহার পাশে। গম্ভীর গলায় বললো—মান্নান মিয়া চিঠিটা দিয়ে গেলো।

বুড়ি মা বলে উঠে—হে আল্লা কোন খারাপ কথা যেন না হয়...

সালেহা চিঠিখানা হাতে নিয়ে ঘামছিঁড়ে মেলে ধরে চোখের সম্মুখে। সাজ্জাদ লিখেছে—তোমার কাছে এই আমার প্রথম চিঠি। কি বলে—সম্বোধন করবো জানিনা। বড়ই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আজকে তোমাদের ওখানে যেতে পারলাম না। আব্বাকে তো জানো। হঠাৎ ওনি তার নিজের বিশেষ কাজে সাত দিনের জন্য আমাকে বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। ফিরে এসেই দেখা করবো। অনেক কিছু জানবার কৌতুহল আছে।

ইতি—

তোমার খেলার সাথী
সাজ্জাদ

সালেহার চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

বুড়ি মা বলে উঠে—আজ কাল্‌কের ছেলে গুলোই ঐ রকম।

সালেহা চিঠিখানা হাতে নিয়ে ঘরের মধ্যে চলে যায়। বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদে। কাঁচের চুড়িগুলি খুলে ফেলে একে একে। জীবনটাই তার দুঃখ ভরা, আনন্দ চাইলে আসবে কোথা থেকে!

কাল যখন মওলা মিয়া এসে সংবাদটা দিয়েছিলো, সালেহা তোর সেই সাজ্জাদকে খুঁজে পেয়েছি।

তখন সালেহা প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেনি। পরে যখন বলেছিলো মওলামিয়া—কাগজের নৌকা বলতেই সে যেন কেমন

আনমনা হয়ে গিয়েছিলো। তখন বুঝতে পেরেছিলো সালেহা—সেই তার সাজ্জাদ। এতো খুশী বুঝি জীবনে সে. কোন দিন হয়নি। কিন্তু এতো খুশী, এতো হাসি সব এক নিমিশে মুছে গেলো। যখন সাজ্জাদের চিঠি পেল সে। মুহূর্তে তার হৃদয়টা কে যেন হাতুড়ির আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলো

অনেক দিন পর সালেহা আজ মনের মতো করে সেজেছিলো। কতদিন পর আবার গিয়ে দাঁড়াবে সে ওর পাশে। কি বলবে, কি বলে কথা শুরু করবে সব মনের মধ্যে গুছিয়ে নিয়েছিলো সুন্দর করে। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া যেমন করে প্রদীপ শিখাকে নিভিয়ে দেয়, তেমনি করে নিভে গেলো সালেহার মনের আলো। ব্যথায় মুষড়ে পড়লো সালেহা।

প্রথম সাক্ষাতেই বাধার পালা পড়লো।

সালেহা সেদিন আর উঠলোনা। খেলোনা পর্যন্ত।

বুড়িমা এসে আদর করে বললো—কি হয়েছে। নাইবা এলো। দেখিস একদিন এসে তোর পায়ে মাথা কুটবে। পুরুষ মানুষ অমনি হয়……

সালেহা চোখ মুছে বলে ছিলো—ওর কোন দোষ নেই সই। সবই আমার অদৃষ্ট।

সালেহা সব কথা বুড়িমাকে পূর্বেই খুলে বলেছিলো। সাজ্জাদের সঙ্গে কি তার সম্পর্ক, সব বুঝিয়ে বলছিলো সে বুড়িমাকে। বুড়িমা কথাটা গোপন রাখতে পারেনি, সালেহার মতামত নিয়ে বলেছিলো মওলামিয়ার কাছে—না বলে তো কোন উপায়ও ছিলো না। কারণ সাজ্জাদ আর সালেহার ব্যাপারটা তারও জানা দরকার।

কথাটা শোনার পর থেকেই মওলামিয়া সাজ্জাদের খোঁজে ছিলো। সালেহার ছোট বেলার সাথী সে, ওদের ভালবাসা কত গভীর বুঝতে পেরেছিলো মওলামিয়া। আনন্দে তার চোখ দু'টো উজ্বল দীপ্ত হয়ে উঠেছিলো।

বুড়িমাও কম খুশী হয়েছিলোনা। সালেহার আনন্দে তারও যে আনন্দ।

তারপর যখন সাজ্জাদ আসতে চেয়েও এলোনা তখন শুধু—সালেহাই ব্যথা পায়নি, বুড়িমা আর মওলামিয়াও ব্যথা পেয়েছে অনেক। সালেহার হৃদয়ের আঘাত অনুভব করেছে তারা অন্তরে অন্তরে।

বুড়িমা সালেহাকে সান্তনা দিয়ে বলে—সই দুঃখ করিস নে। নিশ্চয়ই সে আসবে। আমি বললুম সে আসবে—

বুড়িমার সান্তনা তার হৃদয়ে ধৈর্য্য আনে।

আঁচলে চোখ মুছে উঠে বসে সালেহা। আজ না এলেও আসবে একদিন। সেই দিনের প্রতিক্ষায় প্রহর গুনে সে।

সাজ্জাদ বাইরে থেকে ফিরে এসে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সালেহার সঙ্গে দেখা করবার জন্য মন তার অস্থির হয়ে উঠে। এ ক'দিন যে সাজ্জাদ কি করে বাইরে কাটিয়ে এসেছে সেই জানে। একটা অদম্য স্পৃহা তাকে অহরহ চঞ্চল করে তুলছে।

সালেহার সঙ্গে আবার নতুন করে পরিচয়……কথাটা ভাবতে আনন্দে আপ্লুত হয় সাজ্জাদ। সেই ছোট বেলার কত কথা ভেসে উঠেছে তার মানস পটে। স্কুলের টিফিনে নদীর ধারে সেই ছুটো-ছুটি। খাবার নিয়ে দু'জনা এক সঙ্গে খাওয়া। কাগজের নৌকা তৈরী করে উপহার দেওয়া, কত কথাই আজ নতুন করে মনে হয়েছে সাজ্জাদের।

সালেহার ডাগর দু'টি চোখের চাহনী, মিষ্টি মধুর হাসি সেকি কোন দিন ভুলবার।

সাজ্জাদ বাড়ী ফিরেই মান্নানকে ধরে বসে—মান্নান ভাই ওর সঙ্গে দেখা করবো—ব্যবস্থা করে দাও।

কার সঙ্গে ? তোমার সেই...

হাঁ সেই...

তবে গাড়ী বের করতে বলি ছোট সাহেব ?

বলো।

সাজ্জাদ ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ায়। আজ তার চোখে মুখে উজ্জ্বল আনন্দ ঝরে পড়ছে। তার ছোট বেলার সাথী সালেহাকে আজ সে পাশে পাবে কি আনন্দ।

খুসীতে আত্মহারা হয় সাজ্জাদ।

মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে সাজ্জাদ গাড়ীর পাশে এসে দাঁড়ায়। ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলে—তোমার যেতে হবেনা, গাড়ীতে বসে ষ্টার্ট দেয় সাজ্জাদ।

মান্নান সাজ্জাদের দিকে তাকিয়ে হাসে।

সাজ্জাদের গাড়ী তখন গাড়ী বারেন্দা ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। জনমুখর রাজ পথ বেয়ে সাজ্জাদের গাড়ী ছুটে চলেছে। হাস্য উজ্জল মুখে গাড়ী চালাচ্ছে সাজ্জাদ।

মওলা মিয়ার বাড়ীর সম্মুখে এসে গাড়ী রাখে সাজ্জাদ। নেমে দাঁড়ায়। একটা অভুতপূর্ব শিহরণ তার মনে নাড়া দিয়ে যায়। এই তো আর কয়েক মিনিট। তা'হলেই সালেহাকে সে পাশে পাবে। কতদিন পর হবে তাদের মিলন।

সাজ্জাদ দরজায় টোকা দেয়। এক, দু'তিন বার। কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

সাজ্জাদ এবার কড়া নারে, জোড়ে আরও জোড়ে—ঘট্ ঘট্ ঘট্...

দরজা খুলে যায়।

সাজ্জাদ বিস্ময় ভরা নয়নে তাকায়!

বুড়িমা জিজ্ঞাসা করে—কাকে চাই বাবা ?

সাজ্জাদ বলে—সালেহা আছে—মওলা মিয়ার বোন সালেহা।

সালেহা—সে তো এখন নেই বাবা।

নেই!

না, সে বই পত্তর নিয়ে কোথায় যেন গেলো।

বাড়ীতে বলে যায়নি কিছু?

না তো। সে এমনি রোজই বই পত্তর নিয়ে পড়তে যায়।

ও—আচ্ছা। ফিরে দাঁড়ায় সাজ্জাদ।

বুড়ি মা বলে উঠে—সে এলে কি বলবো।

থমকে দাঁড়ায় সাজ্জাদ, তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বলে—বলো—সাজ্জাদ এসেছিলো।

কথাটা বলেই গাড়ীতে চেপে বসে ষ্টার্ট দেয় সাজ্জাদ।

বুড়িমা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। সালেহার মুখে সাজ্জাদ সম্বন্ধে সব কথাই শুনেছিলো সে। কিছু বলতে যায় কিন্তু ততক্ষনে গাড়ী চলতে শুরু করেছে।

সাজ্জাদ আর বুড়িমা যখন কথা বার্তা হচ্ছিলো, ঠিক তখন সালেহা সেলিমের পাশে বসে নোট লিখে নিচ্ছিলো। সেলিম সালেহার মুখের দিক তাকিয়ে হাসছিলো—আর বুঝিয়ে দিচ্ছিলো।

সালেহার সান্নিধ্য সেলিমের কাম্য। ওকে ওর বড় ভাল লাগে। প্রথম যেদিন সেলিম আর সালেহার মধ্যে পরিচয় ঘটেছিলো, সেদিনের কথা আজও ভুলতে পারেনি সেলিম।

লেকচার থিয়েটার থেকে বেরুতেই স্যার ডেকে বলেছিলেন—সেলিম, একে তোমার নোটগুলি বুঝিয়ে দিও।

স্যারের কথায় সেলিম তাকিয়েছিলো সালেহার মুখের দিকে।

সালেহাও স্থির দৃষ্টিমেলে তাকিয়ে ছিলো সেলিমের দিকে।

সেলিম মৃদু হেসে বলেছিলো সেদিন—আচ্ছা স্যার।

তারপর স্যার চলে গিয়েছিলেন।

সেলিম কিন্তু চট্ করেই সরে যেতে পারেনি। সে তখনও দাঁড়িয়ে ছিলো সেখানে।

সালেহাও তাকিয়ে ছিলো ওর দিকে।

সেলিম হেসে এগিয়ে গিয়েছিলো ওর পাশে—আপনার নাম ?

সালেহাও হেসে জবাব দিয়েছিলো—সালেহা।

এই দিনটির কথা সেলিম কোনদিন ভুলতে পারে না। সেদিন সালেহাকে বড় ভাল লেগেছিলো ওর……তারপর চলে গেছে ক'টি-বছর।

এক সঙ্গে সেলিম আর সালেহা ডাক্তারী পড়ে। সেলিমের সাহায্য সালেহার জীবনের পরম সম্পদ।

পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠে—ক্রিং ক্রিং ক্রিং……

সেলিম উঠে দাঁড়ায়—আপনি এটা লিখে নিন। বাকীটা আমি এসে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

সেলিম পাশের ঘরে গিয়ে রিসিভার হাতে উঠিয়ে নিয়ে বলে হ্যালো……

সালেহা মনোযোগ সহকারে নোট লিখে নিচ্ছিলো।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করে সাজ্জাদ।

সালেহা জুতোর শব্দে চোখ তুলে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে থ' মেরে যায়।

সাজ্জাদও কম আশ্চর্য হয়নি। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সে।

সাজ্জাদ সালেহার ওখান থেকে বাড়ীতে ফিরে না গিয়ে সোজা চলে এসেছে সেলিমের এখানে। সেলিমের সঙ্গে হাসি গল্পে সময় কাটাবে এই ছিলো তার ইচ্ছা।

সেলিমের ড্রইংরুমে সালেহা, এ যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেনা সাজ্জাদ।

সালেহা উঠে দাঁড়িয়েছে। একটা দ্বিধা-দন্ধ-সঙ্কোচ তাকে সঙ্কুচিত করে তুলেছে। সাজ্জাদ এগুতে থাকে।

সালেহা জড়ো সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দৃষ্টি তার স্থির হয়ে রয়েছে সাজ্জাদের মুখে। প্রান ভরে দেখেছে সে সাজ্জাদকে।

উভয়েই নীরব !

কেউ কোন কথা বলতে পারে না।

সাজ্জাদ প্রথমে কথা বলে—তোমার ওখানে গিয়েছিলাম।

সালেহা তবু নীরব।

সাজ্জাদ এগয়।

সালেহা এবার পিছিয়ে যায় কিছুটা।

দু'জন তাকিয়ে আছে দু'জনার দিকে।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করে সেলিম—মিস্ সালেহা লিখা হলো... হঠাৎ সাজ্জাদকে দেখতে পেয়ে বলে উঠে—আরে সাজ্জাদ, কখন এলি ?

সাজ্জাদ বলে উঠে—এইতো—

সেলিম হেসে বলে—তোদের জানা শোনা আছে নাকি ? একটা সিগারেট ধরায় সে।

সাজ্জাদ কিছুটা সচ্ছ হয়ে এসেছে, সেও হেসে বলে—হ্যাঁ, আরে এই তো সেই। তা এখানে—

সেলিম বলে উঠে—আমাদের সঙ্গে পড়ে। এর কথাই তো তোকে বলেছিলাম

সাজ্জাদ অস্ফুট শব্দ করে উঠে—সেলিম—

সালেহা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দু'চোখে তার একরাশ বিস্ময়।

সেলিম অদ্ভুত ভাবে হেসে উঠে। সে হাসির মানে কেউ বোঝে না সে নিজে ছাড়া।

সাজ্জাদ সেলিমের পাশে ঘনিষ্ট হয়ে দাঁড়ায়, স্থির কণ্ঠে বলে—একি হলো রে সেলিম !

সালেহার মুখ মণ্ডল বিষন্ন মলিন হয়ে উঠেছে। দু'চোখ অশ্রু ছল্ ছল্—আংগুল কাঁমড়াতে থাকে সে।

সাজ্জাদ বলে—শেষে একই নৌকায় দু'জন কাণ্ডারী, এ হতে পারে না সেলিম—না না কিছুতেই না। এ কিছুতেই হতে পারে না সাজ্জাদ। কথা শেষ করেই দ্রুত বেরিয়ে যায়।

সেলিম ডেকে উঠে—সাজ্জাদ শোন্—শোন্—

কিন্তু সাজ্জাদ আর ফিরে তাকায় না।

বাইরে মোটর ষ্টার্টের শব্দ হয়।

সেলিম বুঝতে পারে সাজ্জাদ চলে গেলো। সেলিমের মুখ মণ্ডলও গম্ভীর হয়ে উঠলো। মুখ ফিরিয়ে বসলো সে।

সালেহা আর কোন কথাই বলতে পারেনা। পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায় সে কক্ষ থেকে।

বাড়ীতে গিয়ে সব কথা খুলে বলে সালেহা বুড়ীমাকে। তা'ছাড়া আর যে কোন উপায়ও নেই। অসহ্য জ্বালা মনে চেপে বাঁচতে পারেনা সালেহা। মনের মধ্যে গুঁমড়ে কেঁদে উঠে ব্যথা—তাই বলতে বাধ্য হয় সে। বুড়িমা ছাড়া আর বলবেই বা কার কাছে। বুড়িমাই যে এখন তার একমাত্র সান্ত্বনার স্থল!

এসব মওলা মিয়াকেও চট্ করে বলা যায় না। হাজার হলেও সে পুরুষ মানুষ।

সালেহা মনের কথা বুড়িমার কাছে বলে সান্ত্বনা পায়। আজও তাই সব খুলে বলে সে। বলতে বলতে কেঁদে আকুল হয়।

বুড়িমা ওকে সান্ত্বনা দেয়—কাঁদিস না সই। তোদের ভালবাসা সত্যি হয়ে থাকলে—এ ভুল নিশ্চয়ই ভাংবে।

সালেহা কাঁদতে কাঁদতে বলে—আমি জানতাম না, সেলিম সাহেব···একটু থামে সালেহা তারপর বলে—উনি আমাকে বই—নোট দিয়ে সাহায্য করেন—তাই এতো মিশে ছিলাম—কিন্তু···

তুই সাজ্জাদ মিয়াকে বুঝিয়ে বলতে পারলিনে।

সে সুযোগ আমি পাইনি। ও আমাকে ভুল বুঝেছে।

এ ভুল একদিন ভাংবেই। দেখিস্ সই আমি বললাম—

বুড়িমার কথায় সালেহা আশ্বস্ত হতে পারেনা। সে জানে তার মত অপেয় কেউ নেই। আজ আবার নতুন করে মনে পড়ে তৈমুর

চাচার স্ত্রীর কথা। বলেছিলো সে তাকে—তার মত কু'লক্ষনে মেয়ে নাকি দুনিয়ায় জন্মে নাই। জন্মেই মাকে খেয়েছিলো—তারপর নাকি খেয়েছে বাবাকে। নানিকেও খেয়েছিলো সালেহা। তাই এ দুনিয়ায় সালেহার মত অপেয় মেয়ের স্থান নেই। অদৃষ্ট যার মন্দ তার কোথাও সুখ নেই—কাঁদে সালেহা।

প্রাণ ভরে কাঁদে।

বুড়িমা মাথায় হাত বুলিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করে, তবু সালেহা বুঝতে চায়না। একটা অসহ্য ব্যথা গুঁমড়ে কেঁদে মরে তার হৃদয়ের বন্দরে বন্দরে।

সাজ্জাদ বাড়ী ফিরে অস্থির চিত্তে ছট্ ফট্ করতে থাকে। সমস্ত আশা—আকাঙ্খা এক নিমিশে ধুলিসাৎ হয়ে গেছে! সালেহাকে কেন্দ্র করে সাজ্জাদ যে আকাশ কুসুম স্বপ্ন সোধ রচনা করেছিলো—সমস্ত ভেংগে চুরমার হয়েগেছে।

অসহ্য যন্ত্রনায় সাজ্জাদ অস্থির হয়ে পড়ে।

ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারী করে সে নিজের ঘরে। ভাল লাগেনা কিছু। চিন্তা করে কোন সান্ত্বনা খুঁজে পায়না। ভাবে, শহর ছেড়ে কোথাও চলে যাবে। এতে যদি মনটা কিছু সুস্থ হয়।

হঠাৎ মনেপড়ে শিকারে গেলে মন্দ হয়না। কয়েক দিন তবু এই পাষাণ প্রাচীরে ঘেরা বন্দীখানা থেকে রেহাই পাবে।

বৈকালে বন্ধুকটা নিয়ে পরিস্কার করছিলো সাজ্জাদ।

এমন সময় সেলিম আসে সেখানে। শান্ত ধীর স্থির কণ্ঠে বলে—সাজ্জাদ।

চোখ তুলে তাকায় সাজ্জাদ, কোন কথা বলে না।

সেলিম সাজ্জাদের পাশে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখে—শোন্ আমি তোর ভুল ভাংতে এসেছি।

সাজ্জাদ বলে—তুই এখানে—

সেলিম বিনয় ভরা গলায় বলে—কোনদিন ভাবিনি সাজ্জাদ যে একটি মেয়েকে ঘিরে আমরা দু'জনে ভালবাসার বুহ্য রচনা করেছিলাম।

আমিও ভাবিনি। ছোট বেলায় ওর সাথে আমার জানা শোনা ছিলো। তোর সঙ্গে হয়েছে যৌবনে। তোর দাবী বেশী। তুই আমার একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু। তোর মনে আমি ব্যথা দিতে চাই না।

সেই কথা আমারও। তুই আমারও একমাত্র বন্ধু। তোর মনে আমিও আঘাত দিতে পারিনা—একটু থেমে বলে সেলিম—সালেহাকে আমার ভাল লেগেছিলো, কিন্তু সালেহার দিক থেকে আমি কোন সঠিক সাড়া পাইনি। তাই……

দেখ সেলিম, আমি আশা করি এ সব ব্যাপার নিয়ে তুই আর কোন কথা বলবি না। আমি খুসি হব যদি তুই এখান থেকে চলে যাস্।

কিন্তু সাজ্জাদ……

না না আর কোন কথা নয় সেলিম। তুই চলে যা—সাজ্জাদ বন্ধুক হাতে চলে যায় সেখান থেকে।

সেলিম কিছুক্ষণ স্তব্ধ নয়নে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়।

বিমর্ষ মন্থর গতিতে বাড়ীতে প্রবেশ করে সেলিম।

মা তখন রান্না ঘরে কি যেন কাজ করছিলেন।

সেলিম নিজের ঘরে প্রবেশ করে গা থেকে কোট টা খুলে ফেলে। তারপর সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দেয়।

রাত বেড়ে আসে।

মা মনে করে এখনও বুঝি সেলিম ফিরে আসে নাই। টেবিলে ভাত বেড়ে পুত্রের প্রতিক্ষা করেন তিনি।

সেলিম নির্জন কক্ষে পায়চারী করে। কখনও সোফায় বসে সিগারেট ধরায়। তারপর একসময় বেহালাটা টেনে নেয় সে।

গভীর মনোযোগ দিয়ে বেহালা বাজাতে থাকে। সমস্ত অনুভুতি দিয়ে বাজায় সেলিম আজ।

বেহালার সুরে মা চমকে উঠেন, আজ যেন সেলিমের বেহালার সুর করুন কাঁন্নায় ভরে উঠেছে।

পুত্রের কক্ষে প্রবেশ করেন মা।

কক্ষ অন্ধকার।

খাটের পাশে বসে সেলিম তার বেহালায় সুর সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু এ সুর প্রতিদিনের মত স্বাভাবিক নয়। অদ্ভুত এক সুরে বেজে চলেছে বেহালা।

মা স্তম্ভিত হন। কক্ষে প্রবেশ করে আলো জ্বালেন। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যান তিনি পুত্রের পাশে। বলে উঠেন—খোকন, তোর কি হয়েছে রে ?

সেলিম বেহালা থামিয়ে হাসতে চেষ্টা করে বলে—কই কিচ্ছুতো হয়নি মা।

আমার কাছে লুকোচ্ছিস্ ? যে করে আজ বেহালা বাজাচ্ছিলি এরকম করে তো কোনদিন বাজাস্ না।

সেলিম নিশ্চুপ, তার গোটা মুখমণ্ডলে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। অন্তরে তার অসহ্য জ্বালা গুমড়ে কেঁদে মরছে।

মা জিজ্ঞাসা করেন—তখন সালেহা আমাকে কিছু না বলেই চলে গিয়েছিলো। তুই ও চলে গেলি আমাকে না বলে। ফিরলি কখন তাও জানিনা। তোদের মধ্যে কিছু হয়নি তো ?

সেলিম এবার কথাবলে—ঠিকই ধরেছো মা—

কি হয়েছে বাবা ?

সাজ্জাদের সঙ্গে সালেহার ছোট বেলার জানা সোনা।

বলিস কিরে ?

হাঁ মা, আর ওরা এখনও দু'জনাকে দু'জনা ভালবাসে। তুমি ওকে পুত্র বধু করতে চেয়েছিলে—সে আশা আর কোরনা মা। সে আশা আর কোর না।

সেলিমের কথায় মা মুষড়ে পড়েন। সালেহাকে তিনিই কি কম ভাল বেসে ছিলেন। সেলিমের পাশে সালেহাকে নিয়ে তিনি যে স্বপ্ন-নীড় রচনা করে ছিলেন তা বলবার নয়।

সেলিমের মুখে কথাটা শুনে স্তম্ভিত হতবাক হন। কিন্তু নিজকে সংযত করে নিয়ে বলেন—খোকন, দুঃখ করিস্ না বাবা। সবই অদৃষ্ট।

সেলিম কচি বালকের মত মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে।

মা স্ব-স্নেহে পুত্রের মাথায় হাত বুলিয়ে চলেন।

সালেহা রোগীদের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ভুলতে চেষ্টা করলো গত কালকের ঘটনাটা। সেই যে কাল থেকে তার মনে একটা ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়েছে আজও তার শেষ হয় নাই। মনের অস্থিরতা নিয়ে গোটারাত তার অনিদ্রায় কেটেছে।

ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়েছিলো সালেহা। হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেংঙ্গে গিয়েছিলো তার। তারপর সারাটা দিন মনের অশান্তি কমেনি এতোটুকু।

বাড়ীতে ভাল লাগেনি, চলে এসেছিলো হস্পিটালে! ভেবেছিলো রোগীদের নিয়ে মেতে থাকবে। গত দিনের কথা মুছে ফেলবে হৃদয় থেকে। কিন্তু পারেনি সালেহা। যতই সাজ্জাদ আর সেলিমের কথা ভুলতে চেয়েছে ততই গভীর হয়ে ভেসে উঠেছে ওদের দু'জনার মুখ তার মনের আকাশে।

সালেহা যখন ৭নং ওয়ার্ডে একটি রোগী নিয়ে ব্যস্ত, তখন সেলিম খুঁজে ফিরছিলো তাকে।

সালেহা ফিমেল ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এলো। সেলিম তাকে লক্ষ্য করে বলে উঠে—এই যে মিস্ সালেহা। কখন থেকে আপনাকে খুঁজছি।

সালেহা থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকায় সেলিমের মুখে। তারপর গম্ভীর গলায় বলে—কি বলবেন, আমি জানি।

আপনি সব কথা জানেন না। একটু সময় নিয়ে ওদিকে চলুন—আমার কাজ আছে।

দোহাই আপনার—এতোটুকু ভুলের জন্য আমাদের তিন জনার জীবন বিষিয়ে উঠেছে।

সালেহা বলে উঠে—স্যার দেখলে কি ভাববেন বলুন তো?

সেই জন্যই তো বলছি ঐ দিকে চলুন—দেখুন যা ঘটে গেছে তার জন্য আমি লজ্জিত-দুঃখিত। সাজ্জাদের বাসায় গিয়েছিলাম। আপনি যে আমাকে ভালবাসেনা না—ওকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু—পারিনি। ও বিশ্বাস করতে চায় না। তাই আপনাকে এ ভুল ভাংতে হবে।

আমাকে?

হাঁ আপনাকে। ওকে বোঝাতে হবে আপনার আমার সম্পর্ক বন্ধুর—অন্য কিছু নয়। সাজ্জাদকেই আপনি ভালবাসেন—কিন্তু...

না না এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই। আপনাকে আমি কখনও অসম্মান করিনি। এখন যে আপনি আমার ভাবী বন্ধু পত্নী সেই দাবী নিয়েই বলছি—

ওর ঠিকানা আমার জানা নেই।

সে কোন অসুবিধা হবে না। আমি দূর থেকে ওর বাড়ী দেখিয়ে দেবো আপনাকে। একটু ভেবে বলে সেলিম—ও খুব ভেংগে পড়েছে। মিস্ সালেহা আপনি ছাড়া কেউ ওর ভুল ভাংতে পারে না। প্লিজ চলুন—চলুন মিস সালেহা—

সালেহা সেলিমের কথা ফেলতে পারে না। গম্ভীর ভাবে চিন্তা করে দেখে সত্যি সামান্য একটা ভুলের জন্য তিনটে জীবন বিনষ্ট হতে পারে না। যাবে সে, সাজ্জাদের ভুল ভাংতে চেষ্টা করবে। মনস্থির করে নেয় সালেহা, বলে—চলুন।

সেলিম খুসী হয়, একটা পাষান ভার যেন ওর মন থেকে নেমে যায়। সাজ্জাদের মঙ্গলই সেলিমের কামনা। সাজ্জাদ তাকে ভুল বুঝতে পারে কিন্তু সেলিম ভুল করতে পারে না।

সেলিম সালেহাকে নিয়ে সাজ্জাদের বাড়ীর অদূরে গাড়ী থেকে নেমে পড়লো। দেখিয়ে দিয়ে বললো সেলিম—ঐ যে সাদা বড় বাড়ীটা। সোজা চলে যান, গেট খোলাই রয়েছে।

সালেহা তাকালো সেলিমের মুখের দিকে।

সে মুখে নেই এতোটুকু ভাবের পরিবর্তন। তেমনি হাস্য উজ্জ্বল দীপ্ত মুখে তাকিয়ে আছে সেলিম সালেহার মুখের দিকে।

সালেহা এগিয়ে যায়।

গেট পেরিয়ে গাড়ী বারেন্দায় পৌঁছতেই, মান্নান এগিয়ে আসে—কাকে চাই ?

যদিও বহুদিন চলে গেছে তবু চিনতে ভুল হয় না সালেহার। মান্নানকে সে চিনতে পারে, বলে—তুমি মান্নান ভাই না ?

হাঁ। কিন্তু তুমি কে ?

আমি সালেহা।

বিস্ময় ভরা চোখে নিপুন দৃষ্টি মেলে তাকায় মান্নান সালেহার মুখে। তারপর বলে উঠে—তুমি সেই সালেহা। চন্দন পুরের.....

হাঁ এই তো চিনে ফেলোছো।

খুসীতে আত্মহারা হয় মান্নান, ভাবে তার ছোট সাহেব যার জন্য এতো উৎগ্রীব তাকে আজ পেয়েছে সে। আনন্দ বিগলিত কণ্ঠে বলে—এসো-এসো, বসো, ছোট সাহেব এক্ষুণি আসবে।

এমন সময় তমিজউদ্দিন সাহেব উপস্থিত হন সেখানে। তিনি হলঘরের মধ্যে থেকে মান্নান আর সালেহার কথাবার্তা শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি মান্নানকে ডেকে বলেন—শোন্।

তমিজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে মান্নান চলে যায়।

সালেহা নত মস্তকে ভাবতে থাকে। তমিজউদ্দিন সাহেবের মুখ ভাব তার কাছে প্রসন্ন বলে মনে হয় না।

তমিজউদ্দিন সাহেব কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করেন—মান্নান, মেয়েটি কে ?

মান্নান খুসী হয়ে বলে উঠে—চন্দনপুরের সালেহা। ঐ যে আমাদের ছোট সাহেব যার সঙ্গে খেলা ধুলো করতেন, এ সেই সালেহা। তারপর আপন মনেই বলে—কত বড় হয়েছে। কি সুন্দর হয়েছে মেয়েটা—তাই না হুজুর!

সেই মেয়ে এটা! এখানে এসেও ওর পিছু ছাড়েনি! আমি বুঝতে পারছি কেনো সাজ্জাদ ভাল ভাল চাকুরীর অফার পেয়েও জয়েন করছে না। ঠিক্ আছে, ছোট সাহেব এলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিবি।

আচ্ছা হুজুর।

তমিজউদ্দিন সাহেব নিজের কক্ষে চলে যান।

সালেহা নত মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ফিরে যাবে কিনা ভাবছে, এমন সময় সাজ্জাদ এসে পড়ে। সালেহাকে দেখা-মাত্র সাজ্জাদের মুখ মণ্ডল-গম্ভীর থম থমে হয়ে পড়ে। কিছু বলতে যাবে সাজ্জাদ এমন সময় মান্নান এসে বলে—ছোট সাহেব, হুজুর আপনাকে ডাকছেন।

সাজ্জাদ সালেহার দিকে তাকালো।

সালেহা হঠাৎ কিছু বলতে পারলো না, মুখ নীচু করে নিলো।

সাজ্জাদ পিতার ঘরে প্রবেশ করে বললো—আমায় ডেকেছেন?

অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বসেছিলেন তমিজউদ্দিন সাহেব। সাজ্জাদকে লক্ষ্য করে বলেন—হাঁ। শোন সাজ্জাদ, আমি কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি তুমি যেন কি রকম হয়ে গেছো। আমি জানতে চাই তুমি চাকুরীতে জয়েন করছো কবে?

সাজ্জাদ নীরব দাঁড়িয়ে থাকে।

তমিজ উদ্দিন সাহেব বলেন—চুপ করে রইলে কেনো? জবাব দাও।

সাজ্জাদ একবার নত দৃষ্টি তুলে তাকালো তারপর বললো—চাকুরীতে জয়েন করা আপাততঃ আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

তমিজ উদ্দিন সাহেব বলেন—কেনো সম্ভব হচ্ছে না? এবার রাগত কণ্ঠে বলেন তিনি—তুমি কি মনে করো আমি কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না। যে মেয়ের সঙ্গ ছাড়িয়ে তোমাকে গ্রাম থেকে শহরে পাঠিয়েছিলাম। তোমাকে শিক্ষিত করেছি.....তবু তুমি... এক মাত্র সন্তান তুমি আমার। তুমি কি জানো না ঐ মেয়ের সঙ্গে তোমার কোন দিনই বিয়ে হতে পারে না। আমার বংশ মর্যাদা আছে। তা'ছাড়া তোমার মামার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা পাকা হয়ে আছে.....রাগে ক্ষোভে তমিজউদ্দিন সাহেবের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

এতোক্ষণ স্তব্ধ হয়ে, সাজ্জাদ পিতার কথাগুলি শুনে যাচ্ছিলো। এবার সে বলে উঠে—আপনি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে যাবেন?

তমিজউদ্দিন সাহেব গর্জে উঠেন—থামো! উপদেশ দিতে এসো না! কিসে ভাল হয়, কিসে মন্দ হয়—সে আমার জানা আছে।

সাজ্জাদ একবার তীব্র কটাক্ষে পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলো।

ফিরে এলো সাজ্জাদ, যেখানে কিছু পূর্বে সালেহা দাঁড়িয়েছিলো সেইখানে, কিন্তু দেখতে পেলো—সালেহা নেই।

সাজ্জাদ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। গভীর একটা বেদনা তার অন্তরে আগুন ধরিয়ে দিলো।

সাজ্জাদ ভাবছে এমন সময় মান্নান এসে বললো—ছোট সাহেব সে চলে গেছে।

ফিরে তাকালো সাজ্জাদ তার মুখের দিকে, কোন কথা বলতে পারলো না।

মান্নান বলে চলে—কই তাকে তো তুমি বসতেও বললে না ছোট সাহেব ? কত দূর থেকে সে এসেছিলো। তোমাকেই খুঁজছিলো সে।

নিজ মনেই বলে উঠে সাজ্জাদ—আমাকেই খুঁজছিলো।

হাঁ ছোট সাহেব, সে এসেই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলো। আহা মেয়েটাকে তুমি যখন রেখে চলে গেলে, একটা কথাও তার সঙ্গে বললে না। কি বলবো ছোট সাহেব তখন সে যে কি দুঃখ পেলো ...আহা বেচারী কেঁদেই ফেললো। আমি কত করে বসতে বললাম—বসলো না চলে গেলো।

সাজ্জাদ নিশ্চুপ শুনে গেলো মান্নানের কথাগুলি। মাথার মধ্যে তখন তার বন বন করে ঘুরছে।

সাজ্জাদের ওখান থেকে ফিরে এসে সালেহার গোটা অন্তর হতাশায় ভেংগে পড়লো। তাকে পেয়েও পেলো না সালেহা। সে জানে তার অদৃষ্টে এতো সুখ সইবে না। কোন দিন পাবে না সে এতোটুকু শান্তি। কত সাধনার পর পেয়েছিলো ওর দেখা, তাও অন্ধকারে অদৃশ্য হলো।

সালেহা যখন নিশ্চুপ বসে বসে তার জীবনের বেদনাময় মুহূর্তের কথাগুলি স্মরণ করছিলো, তখন মাওলা মিয়া একখানা চিঠি এনে সালেহার হাতে দিলো—চিঠি এসেছে।

বহুদিন পর আজ আবার পোষ্ট কার্ড। তাড়া তাড়ি সালেহা চোখের সম্মুখে তুলে ধরে। এ যে তার তৈমুর চাচার চিঠি। এতোদিন পর আবার কি লিখেছেন তিনি, পড়ে সালেহা—

মা সালেহা—

আশা করি কুশলে আছো। পর সমাচার এই যে তোমার চাচী মা প্রায় তোমার কথা আলাপ করেন। তার ভুল বুঝতে পেরেছেন। তার একান্ত অনুরোধ তুমি ডাক্তারী পাশ করে গ্রামে ফিরে আসবে।

কাদের ডাক্তারের নির্মম ব্যবহারে মানুষ মর্মাহত। গ্রামের সবাই তোমার মুখ চেয়ে আছে। আমার বিশ্বাস তুমি আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে। খোদা তোমার মঙ্গল করুন। মওলা মিয়াকে আমার ছালাম বলো। ইতি—

তোমার তৈমুর চাচা।

মওলা মিয়া দাঁড়িয়ে ছিলো, বলে উঠে— কার চিঠিরে? সঙ্গে সঙ্গে কানতে শুরু করে সে।

সালেহা বলে—তৈমুর চাচা লিখছেন।

মওলা মিয়ার কাশি আরও বেড়ে উঠে। পাশের টুলে বসে পড়ে সে। সালেহা তাড়া তাড়ি এসে মওলামিয়াকে ধরে ফেলে।

হঠাৎ দেখতে পায় মওলা মিয়ার ঠোঁট বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। সালেহার মুখ মণ্ডল মূহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে উঠে, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠে সে—এ রকম যে হবে আমি জানতাম। কত নিষেধ করছি ও সব খেওনা।

মওলা মিয়া হাঁপাচ্ছিলো, কোঁকিয়ে বলে উঠে—আমার সময় হয়ে গেছে বোন। তোর জীবনে আমাকে যতটুকু প্রয়োজন ছিলো তা ফুরিয়েছে—

মওলা মিয়ার কথায় সালেহার অন্তর হাহাকার করে কেঁদে উঠে। কিছুক্ষণ তার কণ্ঠ দিয়ে কোন কথা বের হয়না। ঠোঁট দুটো বার কেঁপে উঠে শুধু। গণ্ডবেয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। এবার বলে সে—ভাইয়া, তোমার সাহায্য নিয়ে যদি ডাক্তারী পড়া আমার সত্য হয়ে থাকে—তা'হলে আমি বেঁচে থাকতে তোমাকে কিছুতেই মরতে দেবোনা।

বুড়িমাকে ডাকে সালেহা—সই-সই এসো একটু পানি নিয়ে এসো...

ছুটে আসে বুড়িমা, মওলা মিয়ার মুখে রক্তের দাগ দেখে আর্ত কণ্ঠে অস্ফুট শব্দ করে উঠে—ওগো, একি হলো গো। একি হলো।

বুড়িমা আর সালেহা মওলা মিয়াকে ঘরে নিয়ে শুইয়ে দিয়ে সেবা যত্ন শুরু করে।

সালেহা জানে—যে অসুখ দেখা দিয়েছে আজ মওলা মিয়ার মধ্যে, তার চিকিৎসার জন্য চাই মূল্যবান ঔষধ পত্র আর ইন্‌জেকসন তখনই সে নিজে চললো ঔষধ আর ইন্‌জেকসন আনতে।

সালেহা যখন মওলা মিয়াকে নিয়ে অস্থির ঠিক্ তখন সাজ্জাদ তার নিজের ঘরে ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারী করে চলেছে। বার বার নিজের চুল ধরে টানছে। মনের অস্থিরতা তার সমস্ত মুখে ফুটে উঠেছে। কিছুতেই সে নিজেকে প্রকৃতিস্থ রাখতে পারছে না। এবার সে দ্রুত বেরিয়ে এগিয়ে চললো——

তমিজ উদ্দিন সাহেব বলে উঠেন— কোথায় যাচ্ছো ?

সাজ্জাদ থম্‌কে দাঁড়িয়ে জবাব দেয়—সালেহার ওখানে।

তমিজউদ্দিন সাহেবের চোখ দু'টো আগুনের ভাটার মত জ্বলে উঠে। গর্জে উঠেন তিনি—তোমার এতো বড় স্পর্দ্ধা—আমার সামনে একথা বলতে লজ্জা করে না ?

না! বলেই যেতে উদ্যত হয় সাজ্জাদ।

গম্ভীর কঠিন স্বরে বলে উঠেন তমিজ উদ্দিন সাহেব—আমি বলছি তুমি যেওনা।

আমাকে যেতে হবে।

তুমি আমার অবাধ্য হলে-তার পরিনাম যে কতখানি খারাপ হতে পারে তা তুমি জানো না সাজ্জাদ।

জানি আব্বা। সালেহা সম্বন্ধেও আমার অনেক জানবার আছে। অনেক কিছু বলবার আছে। অমাকে অপনি ক্ষমা করুন আব্বা... কথা শেষ করে দ্রুত বেরিয়ে যায় সাজ্জাদ।

তমিজ উদ্দিন সাহেব চীৎকার করে বলে উঠেন—সাজ্জাদ—শোন যেওনা—যেওনা.....একটা সোফায় বসে পড়েন তিনি।

বাইরে মোটর ষ্টার্টের শব্দ শোনা যায়।

তমিজ উদ্দিন সাহেব নিজ মনেই বলে উঠেন্—আমি তোর ভালর জন্যই বলেছিলামরে।

সাজ্জাদ নিজেই ড্রাইভ্ করে চলছে।

উল্কা বেগে ছুটে চলছে তার গাড়ী খানা। চোখের সম্মুখে সালেহার করুণ মুখ খানা ভেসে উঠছে। কানের কাছে শুনতে পাচ্ছে তাঁর পিতার কণ্ঠস্বর—তুমি আমার অবাধ্য হলে তার পরিনাম যে কত ভয়াবহ হতে পারে তা তুমি জানো...সাজ্জাদ যেওনা...যেওনা...

সাজ্জাদের চিন্তার সঙ্গে গাড়ীর স্পীড্ বেড়ে চলে।

জোরে আরো জোরে ছুঠছে গাড়ীখানা। উন্মত্ত বাতাসে চুল গুলি বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। কোন দিকে তার খেয়াল নেই। ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে।

সাঁ সাঁ করে গাড়ী ছুটে চলেছে।

হঠাৎ একটা লাইট পোষ্টের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে সাজ্জাদের গাড়ী খানা উল্টে যায়।

তারপর আর কিছু মনে নেই সাজ্জাদের।

মওলা মিয়াকে ইনজেকসন দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় সালেহা। দু'চোখ তার অশ্রু ছল ছল। যেমন করেই হোক ওকে বাঁচাতেই হবে। আজ যদি মওলা মিয়া না থাকতো তা'হলে সে নিশ্চয় ডাক্তার হতে পারতো না। তার শপথ সার্থক হতো না। আজ সালেহার মনে পড়ে প্রথম দিনের কথা। মওলা মিয়া তাকে কেমন ভাবে এই বাড়ীতে নিয়ে এসেছিলো। মনে পড়ে কত আদর করে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলো। তারপর কত দুঃখ কষ্ট করে তার পড়ার খরচ যোগাড় করে দিতো। কতদিন নিজে না খেয়ে মুখের খাবার তুলে দিতো তার মুখে। আজ সে ডাক্তার হতে চলেছে।

তার সপ্ন স্বার্থক হতে চলেছে—সে শুধু মওলা মিয়ার অপরীসিম দয়া আর স্নেহের জন্য.....না না প্রান দিয়েও মওলা মিয়াকে বাঁচাবে সে।

সালেহা মওলা মিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছে, এমন সময় বাইরে কড়া নারার শব্দ হয়।

সালেহা এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। দেখতে পায় ওয়ার্ড বয় একটা চিঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সালেহাকে দেখে চিঠি খানা এগিয়ে ধরে—সার্জ্জন সাহেব দিয়েছেন।

দেখি। সালেহা চিঠি হাতে নিয়ে পড়ে। স্যার লিখেছেন—

সালেহা—

আই নো ইউ।

একটা এ্যাক্সিডেন্ট কেস্ এসেছে। অপারেশন কেস। তোমার এ্যাসিষ্ট আমার প্রয়োজন। চিঠি পাওয়া মাত্র চলে এসো। আই এ্যাম ওয়েটিং ফর ইউ।

ইয়রস্—স্যার

সালেহা বয়কে লক্ষ্য করে বলে—তুমি দাঁড়াও। তারপর ভিতরে গিয়ে দেখে মওলা মিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। বুড়িমাকে বলে—সই, ভাইয়ার ঘুম ভাংলে এই ঔষুধটা খাইয়ে দিও। হসপিটালে যাচ্ছি, তাড়া তাড়ি ফিরবো। বেরিয়ে যায় সালেহা।

বুড়ি মা মওলা মিয়ার শিয়রে বসে পাখাটা হাতে তুলে নেয়। মওলা মিয়ার অসুখের পর থেকে বুড়িমার মনেও শান্তি ছিলোনা। ছোটবেলা হতে ওকে দেখে এসেছে বুড়িমা। কোলে করে মানুষ করেছে সে তাকে! ওর অসুখে দুঃখ হবেই তার।

বাইরে স্কুটারের শব্দ শোনা যায়।

বুড়ি মা বুঝতে পারে সালেহা চলে গেলো।

সালেহা হসপিটাল করিডরে পৌঁছতেই একটি নার্স এগিয়ে আসে সালেহাকে লক্ষ্য করে বলে সে—এসে গেছেন। সার্জ্জন আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

কোথায় তিনি ?

অপারেশন থিয়েটারে।

সালেহা অস্ফুট কণ্ঠে বলে—থ্যাঙ্ক ইউ। তারপর এগিয়ে যায় অপারেশান থিয়েটারের দিকে।

অপারেশন থিয়েটারের সাইড্রুমে বসে ছিলেন সার্জ্জন এবং আরও কয়েক জন।

সালেহা সাইড্রুমে প্রবেশ করে বলে উঠে—গুড ইভিনিং স্যার।

সার্জন সাহেব ও সালেহার কথায় বলেন—গুড্ ইভিনিং। এসে গেছো। ড্রেস্ আপ—কুইক্।

সালেহা বেরিয়ে যায়।

গায়ে এ্যাপ্রন, মুখে মাস্ক, হাতে গ্লোব্স পরা সালেহা এসে দাঁড়ালো অপারেশন থিয়েটারে সার্জ্জন সাহেবের পাশে।

অপারেশন টেবিলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই সালেহা চম্কে উঠলো একি এ যে তার সাজ্জাদ। সালেহার মাথাটা ঝিম্ ঝিম করে উঠে। পা যেন টল্ছে। কোন রকমে নিজকে সামলে নেয় সালেহা।

সার্জ্জন সালেহার মুখ ভাব লক্ষ্য করে বলে উঠেন—আর ইউ নার্ভাস ?

নো স্যার।

সালেহা নিজকে কঠিন করে নিলো।

সার্জ্জন অপারেশন শুরু করলেন।

সালেহা যন্ত্র চালিতের মত তাঁকে সাহায্য করে চললো।

অপারেশন শেষ করে সোজা হয়ে দাঁড়াল সার্জ্জন মিঃ সেন।

অন্যান্য ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধছিলেন। সালেহা হাত পরিস্কার করে নিচ্ছিলো। ব্যাণ্ডেজ বাধা শেষ হলে বলেন মিঃ সেন—স্যালাইন্টা ঠিক্ যাচ্ছে কিনা লক্ষ্য রেখো। ব্লাড্ রিপোর্ট টা দেখি ?

অপর একজন ডাক্তার—হিয়ার ইজ-দা রিপোর্ট স্যার। এ, বি আমাদের ব্যাঙ্কে আছে ?

নো স্যার।

সালেহার হাত ধোয়া হয়ে গিয়েছিলো, সে সার্জ্জনের পার্শে এসে দাঁড়ায়।

সার্জ্জন মিঃ সেন বলেন—এই মুহূর্তে রক্তের বিশেষ প্রয়োজন। কি করা যায়। প্যাসেণ্টের কোন আত্মীয় স্বজনের খোঁজ পাওয়া যায়নি ?

সালেহা সার্জ্জন সাহেবকে লক্ষ্য করে বলে—স্যার।

সার্জ্জন ফিরে তাকাল সালেহার দিকে—ব্লাড্ নাম্বার এ, বি না ?

সালেহা বলে উঠে—স্যার আমার ব্লাড্ নাম্বার এ, বি। যদি আমার রক্ত.....

তুমি ! তুমি রক্ত দেবে ? সার্জ্জনের মুখমণ্ডল উজ্জল হয়ে উঠে।

হাঁ স্যার।

কিন্তু.....

কিন্তু নয় স্যার। আমি ডাক্তার, তা'ছাড়া আমার জীবনের বিনিময়ে ও যদি বেঁচে উঠে—

তুমি ওকে চেনো ?

সালেহা এবার কোন কথা বলতে পারেনা। নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে।

সার্জ্জন গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—হুঁ। তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিলো একটু থেমে বলেন—ওর বাড়ীতে একটা খবর দিয়ে দাও।

স্যার।

বলো ?

আমি ওর বাড়ীতে খবর দিচ্ছি স্যার। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ—আমার রক্ত যে ওর কাজে লেগেছে এ কথা ওর বাবাকে বা ওকে জানাবেন না।

আই নো মাই সান্। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু ঘটে গেছে। বি রেডী।

ইয়েস্ স্যার।

থ্যাঙ্কইউ।

সালেহা পাশের ক্যাবিনে চলে যায়।

রিসিভারটা হাতে উঠিয়ে নিয়ে বলে—হ্যালো। কে সেলিম সাহেব বলছেন?

ও পাশ থেকে ভেসে আসে সেলিমের কণ্ঠস্বর—ইয়েস। সেলিম স্পিকিং, আপনি কে বলছেন? সালেহা—সাজ্জাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো?

সালেহা বলে—সে অনেক কথা। আপনি দয়া করে ওর আব্বাকে একটা খবর দিন! সাজ্জাদ এ্যাক্সিডেন্টে পড়ে হস্পিটালে আছে।

সেলিম আর্ত কণ্ঠে—সাজ্জাদ এ্যাক্সিডেন্ট! আপনি কোথা থেকে বলছেন?

সালেহা বলে—হস্পিটাল থেকে।

সেলিমের কণ্ঠ—কি বললেন হস্পিটাল থেকে? হ্যালো—হ্যালো—

সার্জ্জন সাহেবের ডাকে সালেহা তখন ফোন ছেড়েদিয়েছে। দ্রুত চলে যায় সে ব্লাড ব্যাঙ্ক ক্যাবিনের দিকে।

সেলিম খবর পেয়ে তখনই নিজের গাড়ী নিয়ে ছুটলো সাজ্জাদের বাড়ীতে, তার আব্বাকে খবর দিতে।

তমিজউদ্দিন সাহেব হল ঘরেই বসে ছিলেন। সেলিমকে ব্যস্ত ভাবে প্রবেশ করতে দেখে বললেন—ব্যাপার কি সেলিম? তোমাকে অত্যন্ত উত্তেজিত বলে মনে হচ্ছে!

সেলিম বলে উঠে—চাচাজান, সাজ্জাদ এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।

কি বললে! সাজ্জাদ এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? তড়িৎ গতিতে উঠে দাঁড়ান তমিজউদ্দিন সাহেব।

সেলিম মাথা নত করে বলে—হাঁ। সে এখন হস্‌পিটালে।

মুহূর্তে তমিজ উদ্দিন সাহেবের মুখ মণ্ডল বিষন্ন মলিন হলো। চোখ দু'টো অশ্রু ছল ছল করে উঠলো।

সেলিম বলে—চলুন চাচাজান, এক্ষুনি আপনাকে হস্‌পিটালে যেতে হবে। চলুন।

ড্রাইভারকে গাড়ী.....ততক্ষনাৎ মনে পড়ে গাড়ী তো একটু পূর্বে সাজ্জাদ নিয়ে গিয়েছে। মুখটা ফিরান তমিজউদ্দিন সাহেব।

সেলিম তমিজউদ্দিন সাহেবকে লক্ষ্য করে বলে—আমি গাড়ী এনেছি চাচাজান। চলুন দেরী করবেন না।

চলো বাবা।

সেলিম গাড়ীর দরজা খুলে ধরে। তমিজ উদ্দিন সাহেব গাড়ীতে উঠে বসতেই ; সেলিম ড্রাইভ্ আসনে বসে গাড়ীতে ষ্টার্ট দেয়।

হস্‌পিটালে পৌঁছতে বেশী বিলম্ব হয় না।

সাজ্জাদের বেডের পাশে গিয়ে আবুল ভাবে কেঁদে উঠেন তমিজউদ্দিন সাহেব।

সাজ্জাদের সজ্ঞাহীন মুখের দিকে তাকিয়ে সেলিম স্তব্দ হয়ে গেছে। একটা অব্যক্ত বেদনা তার সমস্ত সত্তাকে যেন লুপ্ত করে দিয়েছে।

একপাশে দাঁড়িয়েছিলো সালেহা, পাথরের মূর্তির মত নিশ্চুপ হয়ে।

সার্জেন্ট ও উপস্থিত ছিলেন সেখানে।

তমিজউদ্দিন সাহেব বালকের ন্যায় রোদন করে উঠেন। একমাত্র পুত্রের এই করুন অবস্থা তার সমস্ত হৃদয়কে বিদীর্ণ করে ফেলে।

সেলিম তমিজউদ্দিন সাবেবকে ধরে ফেলে।

সার্জন সাহেব বলে উঠেন—এটা হস্‌পিটাল ভুলে যাবেন না। ইংগিতে তাকে চুপ হতে বলেন।

সেলিম সান্ত্বনা দেয়।

সালেহা এ দৃশ্য সহ্য করতে পারে না। একটা রুদ্ধ কাঁন্না তার বুকচিরে বেরিয়ে আসতে চায়। অতি কষ্টে নিজকে সংযত করে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

সালেহা সাজ্জাদের সেবায় নিজকে বিলিয়ে দেয়। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত পাশে থেকে সেবা করে সালেহা সাজ্জাদের। নিজেই সে ওর দায়িত্ব ভার গ্রহন করেছে। ঔষধ খাওয়ানো-ইনজেকশন্ সব সে নিজে করে।

মাথায় প্রচণ্ড আঘাত-পাওয়ায় সাজ্জাদের সজ্ঞা এখনও ফিরে আসেনি। চিন্তার শেষ নেই সালোহার।

মাঝে মাঝে তাকে বাড়ীতেও যেতে হয়। সেখানে তারই প্রতিক্ষায় প্রহর গুনছে মওলা মিয়া। বাড়ীতে গিয়ে আবার মওলা মিয়ার চিকিৎসা করতে হয়—ঔষধ খাওয়ানো-ইনজেকশন্ দেওয়া সব সে নিজে করে। আর অন্য সময়ের জন্য সমস্ত বলে আসে সে বুড়ি মাকে। কখন ঔষধ খাওয়াবে—কখন মাথা ধোয়াবে সব সে বুঝিয়ে বলে তাকে।

নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে দিয়ে দিন যায় সালেহার।

এই বিপদ মুহূর্তে বুড়িমা সালেহাকে অনেক সহায়তা করে। মওলা মিয়ার ঔষধ পত্র কিনবার টাকাও সে দেয়। প্রান দিয়ে সেবাও করে মওলার। কারন বুড়িমার কোন সন্তানাদি ছিলো না। ওদের কেই সে খুব ভাল বাসতো।

সালেহা সে দিন সাজ্জাদের এ্যাক্সিডেন্ট ব্যাপারটা ঘটে যাবার পর যখন বাড়ী ফিরে এসেছিলো, তখন বুড়িমা বলে ছিলো—হারে সই, তুই এই আসবি বলে গেলি—আর এলি কখন বল্‌তো?

সালেহা চট্ করে জবাব দিতে প্যারেনি, একটা রুদ্ধ কাঁন্নাকে অতি কষ্টে বুকে চেপে বলেছিলো—সব বলছি সই। তারপর ঘটনাটা বলে ছিলো বুড়িমার কাছে।

বুড়িমা কথাটা শুনবার পর নিশ্চুপ থাকতে পারেনি। প্রায় কাঁদো কাঁদো ভাবে বলে উঠেছিলো—তা'হলে কি হবে?

কি আর হবে বুড়ি মা, যেমন করে হোক ওকে বাঁচাতেই হবে। তুমি ভাইয়ার পাশে থেকে যদি সেবা করো—আমি তা'হলে কতকটা নিশ্চিন্ত মনে ওর সেবা যত্ন করতে পারবো।

বুড় মা খুসী হয়ে বলেছিলো—তোর বুড়ো সই এর উপর এটুকু বিশ্বাস তুই করতে পারিস্। আমি বেঁচে থাকতে মওলাকে মরতে দেবো না। তুই দিবি ওষুধ পত্তর আর আমি করবো সেবা.....

বুড়ি মার দীপ্তময় কথাগুলি সালেহার মনে কি যে শান্তি দিয়েছিলো সেদিন-তা কেউ জানে না।

সেদিন সাজ্জাদকে একটা ইনজেকশন দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই। একজন নার্স এসে বললো—আপনাকে স্যার ডাকছেন।

যাও আসছি।

সালেহা কাজ শেষ করে সার্জ্জন সাহেবের ক্যাবিনে প্রবেশ করে।

ওকে দেখা মাত্র হেসে বলেন সার্জ্জন—সালেহা তুমি ফার্ষ্ট হয়েছো।

সালেহা উচ্ছসিত আনন্দ মনে চেপে বলে—আপনার দোয়া।

হাস্য উজ্জল মুখে বলেন সার্জ্জন সাহেব—তোমার মত ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট আমি খুব কম দেখেছি। বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে।

সালেহা নত মুখে দাঁড়িয়ে থাকে! তার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠে মওলা ভাইয়ার মুখ খানা। তারই অক্লান্ত যত্নে আজ সে এতো বড় একটা ডাক্তার হতে পারলো।

সার্জ্জন বলে উঠে—জয়েন করবে হস্পিটালে?

মুখ তোলে সালেহা—না স্যার, গ্রামে ফিরে যাবো।

সালেহার কথায় খুসী হন সার্জ্জন সাহেব, হাস্য উজ্জল কণ্ঠে বলেন—ও, কে মাই চাইল্ড, উইশ ইউর গুড্ লাক্।

সেদিন বাড়ী ফিরে গিয়ে ছুটে গিয়েছিলো সালেহা মওলা মিয়ার পাশে—ভাইয়া আমি ডাক্তারী পাশ করেছি।

মওলা মিয়া তখন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। সালেহার প্রাণ ঢালা চিকিৎসা আর যত্নে আরোগ্য লাভ করেছে সে।

সালেহার ডাক্তারী পাশের কথাটা শোনামাত্র মওলা মিয়া দু'হাত তুলে ধরলো উপরের দিকে। আনন্দ বিগলিত কণ্ঠে বলতে লাগলো —হে আল্লা লাখো লাখো শুকরিয়া তোমার দরগায়……

সালেহার দু'চোখে গড়িয়ে পড়ে আনন্দ অশ্রু।

তারপর কেটে গেছে কয়েকটি দিন।

সাজ্জাদের আজ জ্ঞান ফিরে এসেছে। সালেহা আড়াল থেকে সব দেখেছে—সব শুনেছে। আনন্দে আপ্লুত হয়েছে তার হৃদয়। সাজ্জাদ আজ নতুন জীবন লাভে সক্ষম হয়েছে। তার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। তার রক্ত দান ব্যর্থ হয়নি, এযে কত বড় খুসীর কথা, সালেহা ছাড়া কেউ জানে না।

কিন্তু সালেহা আর সাজ্জাদের পাশে যায় না। আড়াল থেকেই সরে পড়ে।

সারাদিন মনের সঙ্গে অনেক দন্দ্ব করে সালেহা। ভাবে এখানে আর নয়। শহর ছেড়ে তাকে পালাতে হবে। সাজ্জাদের স্মৃতি তাকে ভুলে যেতে হবে। যাকে সে কোনদিন পাবে না—তাকে ভুলে যেতে হবে।

গভীর রাত।

সালেহা নিজের ক্যাবিনে বসে কি ভাবছিলো। হঠাৎ কি মনে করে ওপাশ থেকে একটা সাদা কাগজ নিয়ে লিখলো, তারপর সুন্দর করে একটা নৌকা তৈরী করলো—কাগজের নৌকা।

কাগজের নৌকাটা কাপড়ের তলায় লুকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলো ক্যাবিন থেকে। চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চললো সাজ্জাদের ক্যাবিনের দিকে।

অতি সাবধানে ক্যাবিনে প্রবেশ করতেই দেখলো সাজ্জাদ অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

সালেহা তার শিয়রে গিয়ে দাঁড়ালো।

তন্ময় দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো সাজ্জাদের মুখের দিকে। দু'ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো তার গণ্ড বেয়ে!

তাড়া তাড়ি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে হাতের পিঠে গড়িয়ে পড়া অশ্রু মুছে ফেললো। তারপর কাপড়ের নীচ থেকে কাগজের নৌকাখানা বের করে ওপাশের টেবিলে রাখলো।

আবার তাকালো সালেহা সাজ্জাদের মুখের দিকে। তারপর দ্রুত বেরিয়ে গেলো ক্যাবিন থেকে।

সালেহা একখানা চিঠি সার্জ্জন মিঃ সেনের নামে লিখে তাঁর টেবিলে চাপা দিয়ে হসপিটাল্ থেকে বেরিয়ে এলো।

ভোরের আলোতে দুনিয়া ভরে উঠেছে।

মওলা মিয়ার পাশে বসে আছে সালেহা। মওলা মিয়া গম্ভীর ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলে—সত্য চলে যাবি বোন? আমাকে ছেড়ে যেতে তোর এতোটুকু কষ্ট হবে না? যা যা বড্ড মায়ার জালে জড়িয়ে ফেলে ছিলিরে। বড্ড মায়ার জালে জড়িয়ে ফেলেছিলি.....

সালেহা বাষ্প রুদ্ধ কণ্ঠে বলে—আমি ভাবিনি আমার জীবনে এমন একদিন আসবে। বহু দুঃখে— মনের অনেক কিছু আমাকে চাপা দিয়ে তোমাকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি। কথা দাও ওসব আর তুমি কোনদিন খাবে না।

মওলা মিয়া বলে—চেষ্টা করবো। ছোট বেলায় এসেছিলি কি করে অতটা সময় পেরিয়ে গেলো বুঝতেই পারলাম না।

আর একটা অনুরোধ—অনুরোধ নয় দাবী। জীবনের বাকী টুকু আমার কাছে থাকবে। গ্রামে ফিরে পসার জমিয়ে উঠলেই তোমাকে নিয়ে যাবো।

বুড়ি মা এক গাল হেসে বলে—আমিও যাবো কিন্তু তোদের ওখানে.....

বেশ তো যেও। আমরা তিন জনা আবার নতুন করে গড়ে তুলবো সোনার সংসার। আবার ফিরে যাবো আমরা পল্লী জননীর বুকে। আমি রোগী দেখবো—মওলা ভাইয়া ওষুধ তৈরী করে দেবে আর সই তুমি করবে রোগীর সেবা.....কি সুন্দর হবে তাই না?

মওলা মিয়া খুসী ভরা কণ্ঠে বলে উঠে—ঠিক বলেছিস্ বোন। ঠিক্ বলেছিস্। চিরদিন কাজ আর কাজ করেই গেলাম—এবার একটু মানুষের উপকার করতে চাই।

বুড়িমা খুসীতে আত্মহারা হয়ে বলে—আমিও চাই পরের উপকার করতে। দশের সেবার মধ্যে নিজকে বিলিয়ে দিয়ে আমি বাঁচতে চাই সই। আমি বাঁচতে চাই...

সত্যি আমি আজ কত খুসী হয়েছি তোমাদের কথায়। তোমাদের দু'জনাকে পাশে পেলে আর আমার কোন দুঃখই থাকবে না। কোন দুঃখই থাকবে না.....কণ্ঠ ধরে আসে সালেহার।

সাজ্জাদ আজ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে।

হস্পিটাল থেকে আজ সে ছাড়া পাবে। তমিজউদ্দিন সাহেব তাকে নিতে এসেছেন। একমাত্র পুত্রের জন্য তিনি অস্থির ছিলেন। আজ তমিজউদ্দিন সাহেবের মনে আনন্দের সীমা নেই। খুসীতে আত্মহারা তিনি।

মিঃ সেন স্বয়ং সাজ্জাদের মাথার ব্যাণ্ডেজ খুলে দিচ্ছিলেন।

পাশে দাঁড়িয়ে সেলিম তাকে সহায়তা করছে।

একজন নার্স এবং আরও একজন ডাক্তার দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে।

সার্জন মিঃ সেন সাজ্জাদের মাথার ব্যাণ্ডেজ খোলা শেষ করে সোজা হয়ে দাঁড়ান। স্মিত হাস্যে বলেন তিনি—কন্‌গ্র্যাচিউলেশন ফর্ ইওর

নিউ লাইফ্। যার সেবা-যত্নে আজ তোমার নতুন জীবন লাভ হয়েছে সে যদি.....হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে যায় সালেহা তাঁকে কথাটা বলতে বারন করেছে। কাজেই তিনি নিশ্চুপ হয়ে যান।

পাশের ডাক্তারটি বলে উঠেন—শুধু তিনি সেবা আর যত্নেই ওকে বাঁচিয়ে তোলেন নাই। নিজের রক্ত দিয়ে ওকে বাঁচিয়েছেন।

হাঁ তা বটে। গম্ভীর কণ্ঠে বলেন সার্জ্জন সাহেব।

সাজ্জাদ বলে উঠে—কে সে? বলুন-বলুন ডক্টর কে সে?

সার্জ্জন কথাটা হঠাৎ বলে ফেলায় একটু বিব্রত বোধ করেন। এবার বলেন—না না কেউনা। কেউনা.....থেমে যান তিনি।

সাজ্জাদ ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠে—ডক্টর আপনি কি যেন বলতে গিয়ে চেপে গেলেন। বলুন-বলুন ডক্টর আমি জানতে চাই কি বলছিলেন আপনি?

তমিজউদ্দিন সাহেব বলে উঠেন—তাকে আমি পুরস্কৃত করবো। যার জন্য আমার এক মাত্র ছেলেকে আমি ফিরে পেয়েছি। আপনি বলুন—বলুন কে সে?

সেলিম, অপর একজন ডাক্তার এবং নার্স সব জানে কিন্তু সবাই তখন নিশ্চুপ রইলো। কারন, সার্জ্জন যখন বলছেন না তখন তাদের বলা উচিত হবে না। কাজেই সবাই চুপ করে রইলো।

কিন্তু সার্জ্জন সাহেবের অজ্ঞাতে সেলিম অন্য ডাক্তারটি এবং নার্স একবার মুখ চাওয়া চাওয়ী করে নিলো!

সার্জ্জন এবার বলেন—আই, এম্ সরি! তার নাম আমি বলতে পারবো না।

সাজ্জাদ উত্তেজিত হয়ে পড়ে—যে আমার জন্য এতো করেছে। যে নিজের রক্ত দিয়ে আমার প্রান রক্ষা করেছে.....না—না তার নামই যদি আমি জানতে না পারি—তা'হলে কি হবে এ প্রাণ দিয়ে। আমি বাঁচতে চাইনা...আমাকে মেরে ফেলুন.....আমাকে মেরে ফেলুন...

সার্জ্জন গম্ভীর গলায় বলে উঠেন—আঃ কি করছো? এ অবস্থায় এতো উত্তেজিত হলে ক্ষতি হবে তোমার।

হোক, হোতে দিন আমি বাঁচতে চাইনা ডক্টর—আমি বাঁচতে চাইনা.....

পুত্রের হঠাৎ এই উত্তেজিত ভাব লক্ষ্য করে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন তমিজ উদ্দিন সাহেব।

সেলিম এবং নার্স সাজ্জাদকে ধরে শুইয়ে দিতে যায়।

হঠাৎ সাজ্জাদের নজরে পড়ে শিয়রের টেবিলে একটি কাগজের নৌকা। সাজ্জাদ তাড়া তাড়ি কাগজের নৌকাখানা টেনে নেয় হাতে। খুলে ফেলে নৌকা খানা!

সবাই দেখতে পায় তাতে স্পষ্ট করে লেখা আছে কয়েকটি কথা সুন্দর মুক্তার মত করে সাজানো লেখাগুলি—আমি গ্রামে, আমার সেই জননী জন্মভুমির বুকে ফিরে যাচ্ছি। তুমি সুস্থ থাকলে তোমার মাঝেই আমি বেঁচে থাকবো।—

সালেহা

সকলেই স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে সাজ্জাদের হাতে কাগজ খানার দিকে। তমিজ উদ্দিন সাহেবের মুখে কোন কথা নেই! নির্বাক পুতুলের মত নিশ্চুপ হয়ে গেছেন। যে সালেহাকে তিনি চিরদিন অবজ্ঞার চোখে দেখে এসেছেন। গরীব বলে ঘৃনা করেছেন। অবহেলা আর লাঞ্ছনায় যাকে বাড়ী থেকে সেদিন বিতাড়িত করে দিয়েছিলেন—সেই সালেহা তার নিজের রক্ত দিয়ে সাজ্জাদের জীবন রক্ষা করেছে। তমিজ উদ্দিন সাহেব যতই ভাবেন ততই কেমন যেন চঞ্চল হয়ে পড়েন। দু'চোখ তাঁর অশ্রু ছল ছল হয়ে উঠে।

গভীর কণ্ঠে এবার বলেন সার্জ্জন মিঃ সেন—সালেহার কাছে আমি একটু শুনেছি। যদিও সে বলতে নারাজ ছিলো তবু যা জেনেছি—আপনারা সালেহাকে চিনতে পারেননি। ওর প্রতি অবিচার করেছেন।

তারপর সাজ্জাদকে লক্ষ্য করে বলেন—উইশ্ ইওর গুড্ লাক মাই বয়। গুড্ লাক……

তমিজ উদ্দিন সাহেব বলে উঠেন—দিনের প্রখর রৌদ্রে আকাশের তারা দেখা যায় না। আমার বংশ মর্য্যাদার কথা ভেবে অন্ধ হয়ে ছিলাম। দেখো বাবা সেলিম, মা যদি আমায় ক্ষমা করে—তাকে ফিরিয়ে আনো। ফিরিয়ে আনো সেলিম……

সেলিম তাকালো সাজ্জাদের মুখের দিকে।

সাজ্জাদের মুখ মণ্ডল খুসীতে উজ্বল দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

সেলিমের মুখে হাসি ফুটে উঠে।

সালেহাকে পেয়ে তৈমুর চাচার আনন্দ আর ধরে না। যাকে হারিয়ে একদিন তার মন বিষাদময় হয়ে উঠেছিলো। দুঃখ বেদনায় জর্জ্জরিত হয়েছিলেন তিনি, আজ সেই সালেহাকে ফিরে পেয়েছেন, কি যে খুসী আজ তৈমুর চাচা হয়েছেন তিনিই জানেন।

সালেহা আজ শুধু ফিরেই আসে নাই। আজ সে ডাক্তার হয়ে এসেছে—মস্ত ডাক্তার।

একদিন যে তৈমুর চাচার স্ত্রী সালেহাকে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা আর জ্বালা -যন্ত্রণা দিয়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো আজ সেই চাচী সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে গ্রহণ করলো তাকে। কোথায় বসাবে—কি খাওয়াবে এ সব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

পর্শীদের ডেকে দেখাতে লাগলো, সালেহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পড়লো সে।

হবুর বৌ এসেছে বেড়াতে, তাকে পাশে বসিয়ে সালেহার বিষয়ে নানা গল্প বলে শোনাতে লাগলো চাচী—শুনেছো বৌ, আমাদের সালেহা খুব বড় ডাক্তার হয়ে এসেছে। হাসপাতালে কাজ করেছে, কত রোগী দেখেছে। মানুষ কেটেছে……এমনি কত কি বলতে লাগলো সে।

হবুর বৌ অবাক হয়ে সব শুনছে। আরও অনেকে এসে জটলা পাকিয়েছে তার চার পাশে। সকলের চোখেই বিস্ময়। যে সালেহা এক দিন খেতে না পেয়ে তৈমুর চাচার বাড়ী কাজ করতো আজ সেই সালেহাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছে তারা।

গ্রামের অনেক ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ এসেছে সালেহাকে দেখতে। সবাই আজ ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে দেখছে তাকে। গ্রামের মাতব্বর গোছের লোক গুলো যারা একদিন সালেহার দিকে ফিরেও তাকাতো না, তারা আজ সবাই ভীড় জমিয়েছে তৈমুর চাচার উঠানে। প্রত্যেকেই সালেহার সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করবার জন্য উন্মুখ। সালেহার সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে তারা যেন ধন্য হন।

অবশ্য এ সবের পিছনে কারণ আছে। আজ গ্রামের ডাক্তার কাদের বক্স নেই। গ্রামের সবাই তার ব্যবহারে বিরূপ হয়ে তাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন গ্রামে ডাক্তার নেই বললেই চলে। টুকি টাকি হাতুরে কবিরাজ ছাড়া কেউ নেই। কাজেই এখন গ্রামে ডাক্তারের নিতান্ত প্রয়োজন।

গ্রামের সবাই সালেহাকে পেয়ে খুসী হয়েছে।

সালেহা পূর্বের সমস্ত কথা ভুলে গিয়ে গ্রামবাসীর সাদর সম্ভাষন মন প্রাণে গ্রহণ করলো। কিন্তু মুখে সে হাসি ভাব প্রকাশ করলেও অন্তরে অন্তরে ব্যথায় মুষড়ে পড়লো। আজ যদি তার নানী বেঁচে থাকতো, না জানি কত খুসী হতেন তিনি।

নানীর সেই মুখখানা মনে পড়তেই সালেহার দু'চোখ ভরে পানি আসে। নানীর সেই আকুল করা কণ্ঠ সে যেন শুনতে পায় কানের কাছে। সালেহা—বোন, লেখা পড়া শিখ্‌বি—মানুষ হবি—বড় বড় বই পড়বি—···ওরে আমি লেখা পড়া জানি না—বই পড়তে পারি না—কত দুঃখ আমার জানিস·····তুই বড় হয়ে, লেখা পড়া শিখে মানুষ হলে আমি তখন কত আনন্দ পাবো·····নানীর কথাগুলো স্মরণ হতেই সালেহার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

আজ আরও কথা মনে পড়ছে তার। ছোট বেলায় স্কুলে সে আর সাজ্জাদ……এই সেই গ্রাম, এর প্রতিটি ধুলি কণায় ছড়িয়ে আছে সাজ্জাদের কত স্মৃতি—কত কথা। আজ আবার সালেহার মনে নতুন করে উদয় হয় সেই শিশু কালের স্বপ্নময় মুহূর্তগুলি।

সেই পথ, সেই মাঠ, সেই ঘাট—সেই আলো হাওয়া—শুধু নেই তার সেই সাজ্জাদ।

সালেহাকে বিষণ্ণ মনে বসে থাকতে দেখে, তৈমুর চাচা উদ্বিগ্ন হন। ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন—মা সালেহা কি হয়েছে তোমার ?

কই কিছু না তো।

হাঁ, মা তবে অমন করে চুপ চাপ বসে আছো কেনো ?

চাচী মা এগিয়ে আসে—তাই তো, কি হলো তোমার ? এসো বাছা এসো—অমন মন মরা হয়ে থেকো না। ও বুঝেছি নানীর জন্য বুঝি মন কেমন করছে ? চিরদিন কি কারো নানী বেঁচে থাকে মা। এই তো আমরা রয়েছি…ভাবনা কি ! তোমার চাচাজান আছেন …

চাচীর দরদ মাখা কথাবার্তা সালেহার কাছে আজ ভালই লাগে। একদিন যে চাচী তার উপরে নির্মম অত্যাচার করে বাড়ী থেকে বিতারিত করেছিলো সেই চাচী তার আশ্রয় স্থল। আজ যদি চাচী তার উপর কোন বিরক্ত ভাব প্রকাশ করতো তাহলে কিছুতেই তার সহ্য হতো না। ব্যথায় জর্জ্জরিত অন্তর ভেংগে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেতো। গ্রামটা তা'হলে তার কাছে বিষাক্ত ময় হয়ে উঠতো।

চাচীর স্নেহ মায়া ভরা কথা তার বিদগ্ধ মনে সান্ত্বনার প্রলেপ হয়ে দেখা দেয়। নীরব নয়ন দুটি তুলে তাকায় সালেহা চাচীর মুখের দিকে।

সালেহা তৈমুর চাচার সাহায্যে গ্রামে একটি ডিস্‌পেন্‌স্যারি দেবার আয়োজন করতে লাগলো। গ্রামবাসীর খুসীর অন্ত নাই। তারা

সালেহাকে নিজ গ্রামে ডাক্তার হিসাবে পেয়ে আনন্দে অধীর হলো। তারাও মনপ্রাণে সালেহাকে সাহায্য করে চলেছে।

সেদিন নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলো সালেহা।

নতুন ডিস্‌পেন্‌স্যারিতে তৈমুর চাচার সঙ্গে কি যেন করছিলো সে, এমন সময় নসু এসে বলে—সালেহা বুবু একজন লোক তোমায় ডাকছে।

সালেহা মাজায় কাপড় জড়িয়ে কাজ করছিলো। তাড়াতাড়ি কাপড় ঠিক্ করে নিয়ে বলে—কোথায় রে নসু ?

ঐ তো বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

যা আমি আসছি।

একটু পড়ে বেরিয়ে আসে সালেহা। আগন্তুকটিকে দেখে বিস্ময়ে চমকে উঠে—আপনি !

এগিয়ে আসে সেলিম—হাঁ আমি।

ও কেমন আছে ? প্রশ্নকরে সালেহা।

ভাল। ছোট্ট জবাব দেয় সেলিম। তারপর একখানা চিঠি বের-করে বলে—মিস্ সালেহা এই নিন সাজ্জাদের চিঠি।

চিঠি !

হাঁ চিঠি।

সালেহা সেলিমের হাত থেকে চিঠি খানা নিয়ে মেলে ধরে চোখের সামনে। সাজ্জাদ লিখেছে—প্রিয়া-সু

ছোট বেলায় মাজারের কথা তোমার মনে পড়ে ?
সেই পাগলা পীরের মাজার। আমি সেই রাস্তায়
তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। এসো—ইতি

তোমার হতভাগ্য সাজ্জাদ

সালেহা চিঠিখানা হাতের মুঠায় চেপে ধরে ছুটতে থাকে।

সেলিম সালেহার খুসীতে আত্মহারা চেহারা খানার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

সালেহা তখন ছুটে চলেছে। মুখ মণ্ডল দীপ্ত উজ্জল। দুই চোখে আনন্দের উৎস! সাজ্জাদ ফিরে এসেছে, এ যে তার কাছে কত বড় খুসীর কথা।

সেলিমও সালেহার খুসীতে আনন্দিত। সালেহাকে এক দিন সে গভীর ভাবে ভাল বাসতো, ওকে পাবার জন্য মন তার উৎগ্রীব থাকতো—আর আজ সেই সালেহার আনন্দে তার আনন্দ, সাজ্জাদকে পেয়ে সে যদি খুসী হয় তাতে সেলিমের কিছু বলবার নেই। সাজ্জাদ-কেও যে সেলিম অত্যন্ত ভাল বাসে। সেলিম নিজকে নিঃস্ব করে দেবে তবু ওদের দু'জনার মিলনই তার কাম্য।

সালেহার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে থাকে সেলিম। মুখ মণ্ডল উজ্জল দীপ্তময়।

ততক্ষণে তৈমুর চাচাও এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেলিমকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কোথা থেকে এসেছেন?

সেলিম বলে—শহর থেকে। আমি সালেহার সঙ্গে ডাক্তারী পড়তাম।

ও বসো বাবা বসো। তৈমুর চাচা একখানা টুল এনে বসতে দেন সেলিমকে।

সেলিম বসে সব কথা খুলে বলে তৈমুর চাচার কাছে। আরও বলে—সেই সাজ্জাদ আজ এসেছে, সমস্ত বাধার প্রাচীর উপেক্ষা করে ছুটে এসেছে সে সালেহার পাশে, আর কেউ তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। তমিজ উদ্দিন সাহেবও সালেহাকে নিতে আসছেন।

সেলিমের কথাগুলি তৈমুর চাচার কানে যেন মধু বর্ষণ করে। এক দিন যে তমিজ উদ্দিন সাহেব সালেহার সান্নিদ্ধ এড়াবার জন্য সাজ্জাদকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন—আজ আবার তিনিই ছুটে আসছেন সেই সালেহাকে সানন্দে গ্রহণ করতে।

খুসীতে তৈমুর চাচা যেন ফেটে পড়েন। হৈ চৈ শুরু করেন—ওরে তোরা সব কোথায় গেলি। দেখে যা কে আসছে।

সেলিম আর তৈমুর চাচা দেখলেন অদুরে গাড়ী রেখে নেমে আসছেন, তমিজ উদ্দিন সাহেব আর মান্নান, পিছনে মওলা মিয়া। মওলা মিয়াই প্রথমে কথা বলে—আপনি কি সেই তৈমুর চাচা—যে আমাকে চিঠি লিখতো ?

হাঁ আমি—আমিই সেই তৈমুর চাচা। কথাটা বলে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি, কোথায় বসাবেন কি করবেন।

বাধা দিয়ে বলেন তমিজ উদ্দিন সাহেব—পরে বসবো। কই, কোথায় আমার সালেহা মা ?

সেলিম মান্নানকে লক্ষ্য করে বলে—মান্নান কেমন করে এ পথ চিনে তোমরা এলে ?

মান্নান দাঁত বের করে হেসে বলে—ঐ মওলা মিয়ার কাছে আমরা পথের সন্ধান পেয়েছি। ওনার কাছেই তৈমুর চাচা চিঠি লিখতেন কিনা, তাই চিঠিতেই ঠিকানা.....

হেসে বলেন তমিজ উদ্দিন সাহেব—আর আমি বুঝি এ গ্রামের ঠিকানা জানতুম না ? একটু থেমে বলেন—আমিও একদিন এ গ্রামে ছিলুম, তবে ঠিকানাটা একটু ভুলেই গিয়েছিলাম।

মওলা হাসে, সেলিম হাসে তৈমুর চাচার সঙ্গে তমিজ উদ্দিন সাহেবও হাসেন। মান্নানের তো হাসির শেষ নেই। সে সবাইকে লক্ষ্য করে বলে—চলুন বড় সাহেব সাজ্জাদ ভাই আর সালেহা কোথায় দেখে আসি।

সবাই এগয় সামনের দিকে।

সাজ্জাদ একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে প্রতিক্ষা করছিলো সালেহার। কত রঙিন স্বপ্ন ফানুসের মত চোখের সামনে ভেসে উঠে বিলীন হয়ে যাচ্ছিলো। আনমনা ভাবে তাকিয়ে ছিলো সে সামনের দিকে।

নিস্তব্ধ দুপুরের আম শাখায় বসে একটা পাখী বৌ কথা কও—বৌ কথা কও বলে চীৎকার করছিলো।

মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় সাজ্জাদ চম্‌কে উঠছিলো। এই বুঝি এলো সে। ফিরে তাকিয়ে আবার হতাশায় মন ভরে উঠছিলো —কই না তো—সে তো এলো না। তবে কি সালেহা তার চিঠি উপেক্ষা করেছে। না সেলিম তাকে চিঠিখানা দেয় নাই। উৎগ্রীব হয়ে উঠে সাজ্জাদের মন, অস্থির চিত্তে তাকায় সে পথের দিকে।

এই পথটা অনেক দূর থেকে দেখা যায়। সাজ্জাদ আম গাছটায় ঠেশ্‌ দিয়ে দাঁড়ায়। ভয় ভীতি দুঃচিন্তা তাকে চঞ্চল করে তোলে, যদি না আসে সালেহা। যদি তাকে ফিরে যেতে হয়। না—না তাকে সালেহা এমন করে ফিরিয়ে দিতে পারে না। সে নিজে সালেহার প্রতি অন্যায় করেছে বলে সেও কি করবে? সেদিন তাকে উপেক্ষা করে তাড়িয়ে দিয়েছে। একটি কথাও সেদিন সাজ্জাদ বলে নাই সালেহার সঙ্গে। কি নির্মম ব্যবহারই না সেদিন করেছিলো সে। আজ সালেহার হাতে ধরে ক্ষমা চাইবে—কিন্তু সালেহা কি তাকে ক্ষমা করবে? তার উপর যে অন্যায় আচরণ করেছিলো সে, তাকি কোনদিন ভুলবার?

হঠাৎ সাজ্জাদ দেখতে পায়, দূরে সালেহা ছুটে আসছে। মুহূর্তে সাজ্জাদের মুখ মণ্ডল দীপ্তময় হয়ে উঠলো। দু'চোখে উচ্ছল আনন্দ উপছে পড়ছে।

ছুটে আসছে, সালেহা। এলো মেলো চুল, আঁচলটা ঝুলছে পিছনে, দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে আসছে সে। খুশীতে ঝলমল করছে ওর চোখ দুটো।

কতদিন পর আবার সে তার সাজ্জাদকে ফিরে পাবে। এ যে কি আনন্দ ভাবতে পারে না কেউ।

সালেহা ভুলে যায় সেদিনের কথা। সাজ্জাদ তাকে কি ভাবে উপেক্ষা করে চলে গিয়েছিলো। ভুলে যায় সব।

অদূরে সাজ্জাদকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সালেহা, তারপর ধীর পদক্ষেপে এগুতে থাকে সাজ্জাদের দিকে।

দু'জন তাকিয়ে আছে দু'জনার দিকে, নিষ্পলক নয়নে। অপুলক এক আনন্দ তাদের হৃদয়ে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। কত দিন পর—কত বছর পর আবার তারা নতুন করে মিলিত হবে। সালেহার হৃদয়ে অজানা একটা শিহরণ জাগে।

সাজ্জাদের মনেও একই আনন্দের সমাবেশ। খুসীর আবেগে দু'হাত প্রসারিত করে দেয় সে সালেহার দিকে।

সালেহা ছুটে এসে ঝাপিয়ে পড়ে সাজ্জাদের বুকে। সাজ্জাদ ওকে নিবিড় ভাবে টেনে নেয় কাছে। তারপর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলে—কেমন আছো?

সাজ্জাদের বুকে মাথা রেখে বলে সালেহা—আর তুমি? ভাল। মুখ নত করে সালেহা।

সাজ্জাদ সালেহার চিবুক ধরে উঁচু করে তোলে।

দু'জন তাকায় দু'জনার দিকে।

এমন সময় একটি ছোট্ট ছেলে আর ছোট্ট মেয়ে একটি কাগজের নৌকা নিয়ে ছুটে যায় তাদের সম্মুখ দিয়ে।

সাজ্জাদ আর সালেহা হাসে, ওদের মনে পড়ে যায় সেই ছোট বেলার স্মৃতি। এমনি করে একদিন তারা ছুটতো কাগজের নৌকা নিয়ে, ভাসিয়ে দিতো নদীর পানিতে, কত আনন্দ পেতো।

সাজ্জাদ আর সালেহা পাগল পীরের মাজারে গিয়ে হাত তুলে দাঁড়ালো।

ঠিক্ সেই সময় অদূরে দেখা গেলো তমিজ উদ্দিন সাহেব, তৈমুর চাচা, সেলিম, মওলা মিয়া আর মান্নান—সালেহা আর সাজ্জাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

সালেহা আর সাজ্জাদ দোয়া শেষ করে এগিয়ে আসে। দু'জন তাকায় দু'জনার মুখে। মৃদু মধুর হাসি হাসে তারা।

সমাপ্ত

আমাদের সদ্য প্রকাশিত কয়েকটি বই—

কবি আজহারুল ইসলাম রচিত

★ **"ছায়াপথ"** (**কাব্য গ্রন্থ**)

এ, এইচ, হাফিজুদ্দিন আহমদ লিখিত

★ **"রাত দেড়টার আগন্তুক"**

(আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে লিখিত গোয়েন্দা উপন্যাস)